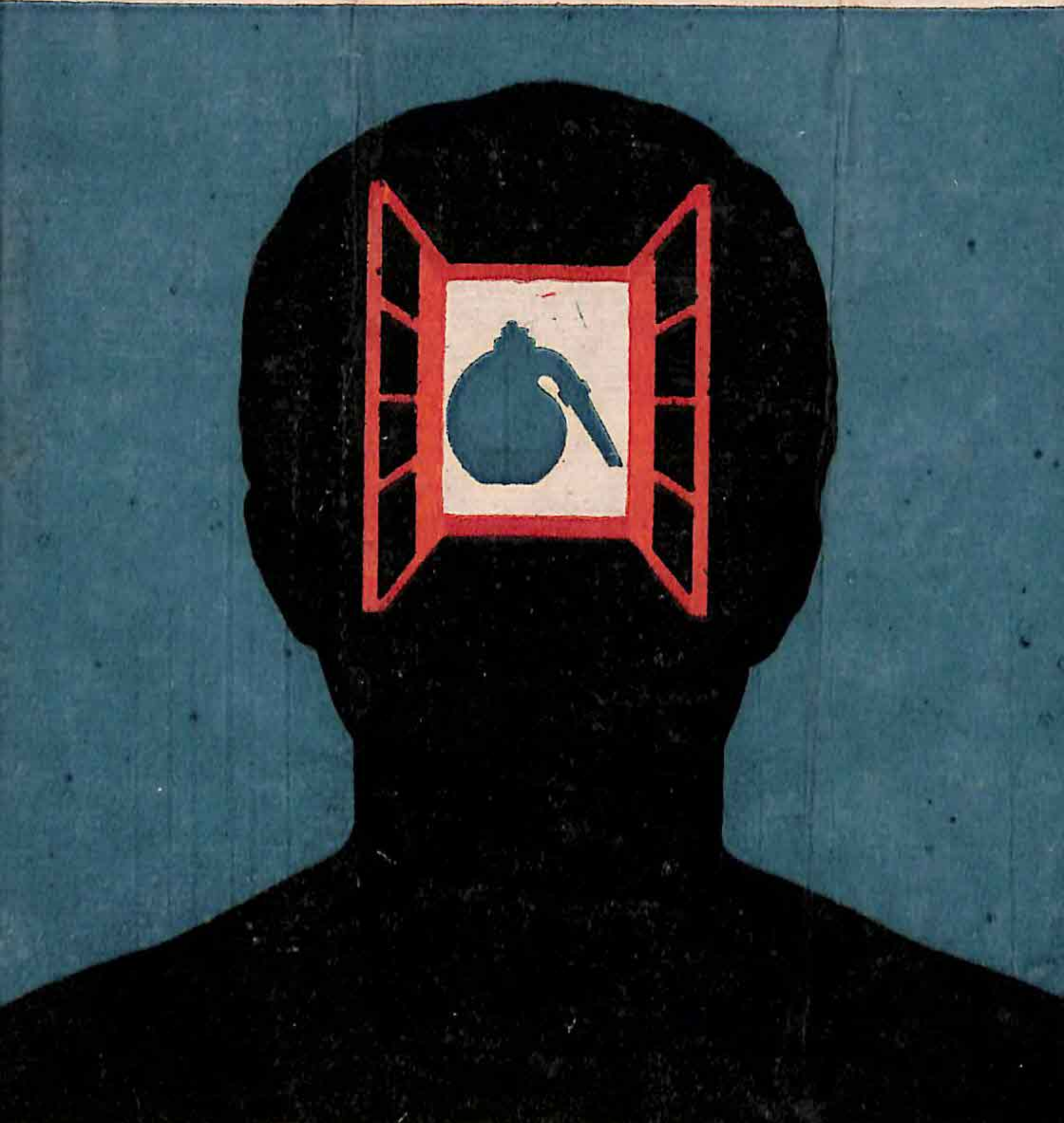
বিজ্ঞান কোষ

সংস্কার-বিজ্ঞান অভিধান



অধ্যাপক সুনির্মল রায়

বিজ্ঞান কোষ

[সংস্কার-বিজ্ঞান অভিধান]

অধ্যাপক সুনির্মল রায়
শ্রেষ্ঠ গবেষণায় আশুতোষ পুরস্কার প্রাপ্ত
দু'বার জাতীয় পুরস্কার প্রাপ্ত ও
আন্তর্জাতিক সম্মান প্রাপ্ত

মালা পাবলিকেশন্স
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা—৭০০০৩৬

অধ্যাপক সুনির্মল রায়ের গবেষণালব্ধ
সংস্কার-বিজ্ঞান অভিধান
বিজ্ঞান আলোয় সংস্কার ও সংশয়

প্রকাশক :
আশিসকুমার বর্দ্ধন
৫১, কালিনাথ মুন্সী লেন
কলিকাতা—৭০০০৩৬

প্রথম সংস্করণ :
জানুয়ারী, ১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ :
মার্চ, ১৯৮৮

তৃতীয় সংস্করণ :
ডিসেম্বর, ১৯৮৯

মূল্য : ২০·০০

মুদ্রাকর :
শ্রীনিতাই সামন্ত
পুষ্প প্রিণ্টার্স
১৫এ, অনাথ দেব লেন,
কলিকাতা-৭০০০০৬

প্রাপ্তিস্থান

মালা পাবলিকেশন্‌স
৪, নিমাই বোস লেন
কলিকাতা—৭০০০০৬

আই. পি. পি. কোং (প্রাঃ) লিঃ
৫৭/সি, কলেজ ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০৭৩

ভূমিকা

আমি দীর্ঘ সতেরো বছর ধরে মানুষের বিভিন্ন ধ্যানধারণা, সংস্কার, অভ্যাস, দৈনন্দিন কাজকর্মের উপর কাজ করছি। কোনটা ভাল কোনটা খারাপ এটা বুঝে উঠতেই আমাদের জীবনের বেশ কিছুটা সময় অতিবাহিত হচ্ছে। কেউ যদি পঞ্চাশ বছর বাঁচে তার মধ্যে প্রায় দশ বছরই নষ্ট হয় অহেতুক এইসব সংস্কার, সংশয়, সন্দেহ, জিজ্ঞাসায়।

এই সংশয়, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা দূর করার প্রয়াসেই আমার দীর্ঘ সতেরো বছরের গবেষণা। এই গবেষণার ফলাফলগুলোই এগ্রন্থে সহজ করে সবার জন্য লেখার চেষ্টা করেছি। আমার এই গবেষণা বিভিন্ন বিজ্ঞানীমহলে আদৃতও হয়েছে। এই প্রয়োজনীয় গবেষণার সঙ্গে সঙ্গে আমি কিছু ধ্যানধারণার শিকড় ধরে নাড়া দেবার চেষ্টা করছি।

সাধারণ পাঠক-পাঠিকা, সাধারণ মানুষ যদি তাদের জীবনে এগুলো প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন তবে আমার এ প্রচেষ্টা সর্বাংশে সফল হয়ে উঠবে।

এই প্রয়াসে আমি নানাজনের কাছ থেকে নানাভাবে সাহায্য পেয়েছি। ৺আচার্য সত্যেন বোস, ডঃ অর্ধেন্দু মুখার্জি, ৺ডঃ জ্যোতিভূষণ চ্যাটার্জি, আমেরিকার ডঃ প্রণব সেন, আমেরিকার রঞ্জিত চ্যাটার্জি, আমেরিকার ডঃ আভুলা, ডঃ দেবেন্দ্র মোহন বিশ্বাস, ডঃ মণি চাকি, ডঃ দিলীপ সিংহ, ডঃ সুকুমার ঘোষ, আমার মেয়ে সৌমি রায়, স্ত্রী অর্চনা রায়, অশোক সেনশর্মা, তরুণ যাও, দামোদর ঘোষ, রীতা হোমরায়, সুদীপ্ত, সমর দে, পীযূষ, রূপক, দেবাশীষ, স্বপন মাইতি, চন্দন, গৌতম, সুব্রত কুমার দত্ত, গায়ত্রী সরকার, দেবযানী রায়, রঞ্জিৎ সিংহ, ডঃ মদন মোহন পালদাস, অধ্যাপিকা স্মিতা সিংহরায়, আশিস্ বর্দ্ধন, পীযূষ রায়, ডঃ অমিত চক্রবর্তী, হিমাংশু চক্রবর্তী, অধীর চক্রবর্তী, অধীর পান, জগন্নাথ পান, সঞ্জয় কর, শ্রদ্ধেয় দেবব্রত মুখোপাধ্যায়, শ্রদ্ধেয় নিরঞ্জন সেনগুপ্ত, অশোক দাস, সুনীল গাঙ্গুলী, রামপদ চৌধুরী ও আরো অনেকে। এদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

অধ্যাপক সুনির্মল রায়

যারা শুধু দিলই, পেল না কিছুই
যাদের ঋণ কোনদিন শোধ করার নয়,
যাদের আশীষ ছাড়া একপাও এগুনো যায় না,
সেই মা ৺নিরুবালা রায়
ও বাবা ৺সুনীল কুমার রায়কে
এ বইখানা উৎসর্গ করলাম।

সূচীপত্র

বিজ্ঞান কোষ

হাতের রেখার সঙ্গে মানুষের অতীত-ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ঃ

প্রথমেই আমরা একটা বিতর্কিত ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করব। হাতের রেখার সঙ্গে মানুষের অতীত ভবিষ্যৎ বা আচার আচরণের সত্যিই কি কোন সম্পর্ক আছে ? প্রশ্নটা বহুদিনের বিতর্কিত। এর সপক্ষে বা বিপক্ষে বলবার মত লোকের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বরং বলা যেতে পারে 'কোন সম্পর্ক নেই' এরকম সিদ্ধান্তই বেশীর ভাগ বিশেষজ্ঞের।

তাঁদের মতে মানুষের মনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু লোকের পয়সা রোজগারের এবং আধিপত্য বিস্তারের এটা একটা উপায় মাত্র। বিজ্ঞানী হিসেবে তাঁরা এ-সম্পর্ক স্বীকার করতে মোটেই রাজি নন। তাঁদের মতে—হাতের রেখা আসলে হাতের মুঠো বার বার ভাঁজ করার উপরেই নির্ভরশীল। আর এ-রেখাগুলো সততই পরিবর্তনশীল। এদের সঙ্গে মানুষের অতীত, ভবিষ্যৎ বা আচার আচরণের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না।

কিছু কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য এ-সম্পর্কের কথা জোর গলায় স্বীকার করেন। এই দলের মতে হাতের রেখার সঙ্গে অতীত, ভবিষ্যতের কতটা সম্পর্ক আছে তা সঠিকভাবে তাঁরা জানেন না, হাতের রেখা দেখে বাড়ি গাড়ি হবে কিনা তা তাঁরা জানেন না। তবে হাতের রেখা দেখে যে মানুষটির কিছু কিছু আচার আচরণের কথা, কিছু কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়, এ-ব্যাপারে তাঁরা একমত।

পরবর্তী দলের মতে হাতের রেখাগুলোর কিছু কিছু হাতের মুঠো কিভাবে ভাঁজ হচ্ছে তার উপরে নির্ভরশীল। তবে কিছু কিছু রেখা যে মানুষটির কিছু কিছু জিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত এ-ব্যাপারেও তাঁরা একমত। 'জিন' কথাটার সঙ্গে নিশ্চয় এখন অনেকেই পরিচিত। এ-গুলি দেহের প্রতিটি কোষে জোড়ায় জোড়ায় থাকে। প্রতিটি

মানুষের প্রতিটি বৈশিষ্ট্যের জন্য একজোড়া জিন দায়ী আছে। কিছু রেখা যেহেতু কিছু জিনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, সেজন্য বিনা দ্বিধায় বলা যায় এই রেখাগুলো হাতের বা এই বৈশিষ্ট্যগুলো দেখে মানুষটির সেই জিনগুলোর চেহারা জানা যায় অর্থাৎ মানুষটির কিছু আচার আচরণ (যেগুলো সেই জিনগুলোর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত)-এর হদিস পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানী গ্যালট-এর কথা কারো অজানা নয়। বিজ্ঞানী পেনা-রাসের কথাও কারো অজানা নয়। তাঁরা দেখিয়েছেন প্রতিটি মানুষের হাতের ছাপ বিভিন্ন। আর এজন্যেই হাতের রেখা দেখে এক একজন মানুষকে আলাদা ভাবে চেনা যায়। অপরাধী নির্ণয়ে আজকাল ফিংগার প্রিন্টের কথা কারো অজানা নয়। বিভিন্ন গবেষণাপত্রে বিভিন্ন বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন হাতের কিছু কিছু রেখার সঙ্গে মানুষের কিছু কিছু নির্দিষ্ট আচার আচরণের সম্পর্ক আছে। অবশ্য হাত দেখায় সময় সাধারণতঃ যে যে রেখা দেখার প্রচলন আছে তার সঙ্গে এই বৈজ্ঞানিক পথের কিছু পার্থক্য আছে। এই সব বিজ্ঞানীরা হাত দেখার সময় অন্য কিছু রেখা দেখে থাকেন। আঙ্গুলের গোড়ায় রেখাগুলোর বৈশিষ্ট্য (আর্চ, লুপ) লক্ষ্য করে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন প্রত্যেকটি হাবাগোবা মানুষের এই রেখাগত বৈশিষ্ট্য নির্দিষ্ট।

কয়েক বছর আগে আগষ্ট মাসে গ্রীসে বিজ্ঞানের এই শাখা নিয়ে একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনও হয়ে গেল। সেখানে আমাদের প্রায় শতাধিক গবেষণাপত্র আলোচিত হয়েছে। তবু আবার বলছি; বিজ্ঞানের এই শাখাকে আরও ভাল করে জানতে হলে আরও গবেষণার প্রয়োজন। আরও বেশীসংখ্যক বিজ্ঞানীকে এই গবেষণার কাজে এগিয়ে আসতে হবে।

থার্মোমিটার কতক্ষণ বগলে রাখা উচিত ?

একটা প্রশ্ন অনেকের মনেই জাগে—থার্মোমিটার বেশীক্ষণ বগলে রাখলে থার্মোমিটারে কি বেশী তাপমাত্রা উঠবে ?

বিশেষজ্ঞের মতে কোন বস্তুর তাপকে জলের সঙ্গে এবং তাপমাত্রাকে জলের লেবেলের সঙ্গে তুলনা করা চলে। উঁচু লেবেলের জল যেমন নিচু লেবেলের দিকে প্রবাহিত হয়, বেশী তাপমাত্রা থেকে কম তাপমাত্রার দিকে তাপেরও তেমনি প্রবাহ ঘটে। অসম তাপমাত্রার ছুটি বস্তুর সংস্পর্শ ঘটালে, কম তাপমাত্রার বস্তুটি বেশী তাপমাত্রার বস্তু থেকে তাপ গ্রহণ করবে। এই তাপ গ্রহণের ফলে বস্তুটির তাপমাত্রা বাড়বে। যখন উভয় বস্তুর তাপমাত্রা সমান হবে তখন তাপের আর প্রবাহ ঘটবে না।

বেশী তাপমাত্রার দেহের সঙ্গে কম তাপমাত্রার পারদের সংস্পর্শ ঘটবে। থার্মোমিটার বগলে দিলে পারদ তাপ গ্রহণ করবে। এই তাপ গ্রহণের ফলে পারদের তাপমাত্রা ও আয়তন বাড়বে। আয়তনের প্রসারণজনিত চাপের প্রভাবে থার্মোমিটারের কুণ্ড থেকে পারদ কাচের কৌশিক নলে ঢুকবে এবং পারদ সূত্রের দৈর্ঘ্য ধীরে বাড়বে। কিছু সময় (প্রায় ৩০ সেকেণ্ড) পরে পারদকুণ্ডের তাপমাত্রা দেহের তাপমাত্রার সমান হবে। তখন পারদ সূত্র কৌশিক নলের যে দাগ পর্যন্ত যাবে তাহাই দেহের তাপমাত্রা সূচিত করবে। দেহ তাপমাত্রা লাভের পর অধিক সময় থার্মোমিটার বগলে রাখলেও পারদের তাপমাত্রা বাড়বে না, এবং আয়তনের প্রসারণও ঘটবে না অর্থাৎ থার্মোমিটারে বেশী তাপমাত্রা উঠবে না।

ফ্যানের স্পীড কমালে মিটার কি কম উঠবে?

ফুলস্পীড থেকে ফ্যানের স্পীড কমিয়ে দিলে মিটার কি কম উঠবে? এ-প্রশ্নও আমাদের মনে জাগে। বিশেষজ্ঞের মতে ব্যয়িত তড়িৎ শক্তি পরিমাপের জন্য রাজ্য বিদ্যুৎ পরিষদ গ্রাহকের বাড়ির তড়িৎ সরবরাহ মেইন্‌-এর সঙ্গে একটি মিটার লাগিয়ে রাখে। মিটারের মধ্যে এ্যালুমিনিয়ামের পাতলা ডিস্ক স্বাধীনভাবে চক্রাকারে ঘুরতে পারে। সুইচ্‌ অন করে ফ্যান চালালে ডিস্কটি ঘড়ির কাঁটার উল্টোমুখে ঘুরতে শুরু করে। ডিস্কটিকে ঘুরাতে যে ঘূর্ণন-বল বা

টর্ক ক্রিয়া করে তার পরিমাণ বাড়লে ডিস্কটির ঘূর্ণন বেগ বৃদ্ধি পাবে, অর্থাৎ এক পাক ঘুরতে কম সময় নেবে। ডিস্কটির ঘূর্ণন সংখ্যার উপর মিটার রিডিং নির্ভর করে। ঘুরন্ত ফ্যানের মধ্যে যে কারেন্ট প্রবাহিত হয় তাকে লোড কারেন্ট বলে। লোড কারেন্ট বাড়লে টর্কের মান বেশী হবে, ডিস্কটি জোরে ঘুরবে এবং মিটার রিডিং দ্রুত উঠবে। সংক্ষেপে বলা যায়—লোড কারেন্ট বেশী বা কম হলে মিটার রিডিং সময়ানুক্রমে দ্রুত বা ধীরে উঠবে।

বৈদ্যুতিক ফ্যানের সঙ্গে একটি রেগুলেটার শ্রেণী সমবায়ে অর্থাৎ সিরিজে যুক্ত থাকে। ফ্যান ও রেগুলেটর যৌথভাবে লোডকারেন্টে প্রবাহে বাধা দেয়। এই বাধাদান ক্ষমতাকে তড়িৎ রোধ বলে। যখন ফ্যান ফুলস্পীডে ঘোরে তখন ফ্যানরেগুলেটরের কার্যকরী তড়িৎ রোধের মান কম হয়। এক্ষেত্রে লোডকারেন্ট বেশী হবে, মিটারের ডিস্কটি দ্রুত ঘুরবে এবং মিটার রিডিং সময় সাপেক্ষে একটু বেশী উঠবে। রেগুলেটর ঘুরিয়ে ফুলস্পীড থেকে ফ্যানের স্পীড কমিয়ে দিলে ফ্যান ও রেগুলেটরের কার্যকরী তড়িৎ রোধ বেড়ে যাবে। সুতরাং লোড কারেন্টের মান অপেক্ষাকৃত একটু কম উঠবে। রেগুলেটর দ্বারা ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে কমিয়ে মিটারের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরন্ত এ্যালুমিনিয়াম ডিস্কের কোন নির্দিষ্ট-সংখ্যক পূর্ণ ঘূর্ণনের সময় পরিমাপ করলেই উপস্থাপিত বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হবে।

সুইচ চালু থাকলে লোডশেডিং-এর পর কারেন্ট এলে মিটার কি বেশী উঠবে?

না, কারণ বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বাড়ির সরবরাহ মেইন্-এর সঙ্গে যে মিটার লাগান থাকে তার রিডিং মুক্তভাবে চক্রাকারে ঘুরতে সক্ষম একটি পাতলা এ্যালুমিনিয়ামের ডিস্কের ঘূর্ণন বেগের উপর নির্ভর করে। বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যানের সুইচ্ অন করলেই লোড-কারেন্ট নামে পরিচিত তড়িৎ প্রবাহের ফলে একটি ঘূর্ণন বল বা টর্ক

ডিস্কটিকে ঘুরাতে থাকে। লোডকারেন্ট বেশী হলে, টর্ক বাড়বে, ডিস্কটি দ্রুত ঘুরবে এবং মিটার রিডিং সময়ের সাপেক্ষে বেশী উঠবে।

বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যানগুলি সরবরাহ ভোল্টেজের সঙ্গে সমান্তরাল সমবায়ে অর্থাৎ প্যারালালে যুক্ত থাকে। এদের মোট তড়িৎরোধ অর্থাৎ লোডকারেন্টের প্রবাহে বাধাদানের ক্ষমতা খুব কম হয়। তাই ফ্যান ও বাতিগুলি একসঙ্গে চালু করলে লোড-কারেন্টের পরিমাণ বেশী হয়।

লোডশেডিংয়ের সময় তড়িৎ সরবরাহ মেইন্‌-এর ভোল্টেজ বা তড়িৎ চাপ শূন্য থাকে। বৈদ্যুতিক বাতি ও ফ্যানের সুইচ চালু থাকলেও কারেন্টের প্রবাহ না থাকায় বাতি জ্বলে না বা ফ্যানও ঘুরে না। বাড়িতে যেসব ফ্যান ও বাতি ব্যবহৃত হয় তাদের তড়িৎ চাপ বা ভোল্টেজ সহ্য করার ক্ষমতা ২২০ থেকে ২৪০ ভোল্টের মধ্যে সীমিত থাকে। লোডশেডিং-এর পর কারেন্ট এলে অল্প সময়ের জন্য তড়িৎ সরবরাহ ভোল্টেজ বা তড়িৎ চাপের পরিমাণ স্বাভাবিক মানের চেয়ে অনেক বেশী হতে পারে। সুতরাং ফ্যান ও বাতির সুইচ্‌ চালু থাকলে লোডকারেন্টের পরিমাণ হঠাৎ বেড়ে যাবে। মিটারের ডিস্কটি ক্ষণকালের জন্য দ্রুততর বেগে ঘুরবে। এক্ষেত্রে মিটার রিডিং লাফিয়ে বেশী উঠবে না কিন্তু ফ্যানের মোটর কয়েলের ইন্‌সুলেশন এবং বাতির ফিলামেন্ট নষ্ট হবার সম্ভাবনা থাকবে।

বাজ পড়ার সময় খোলা মাঠে থাকা কি নিরাপদ?

বিশেষজ্ঞদের মতে আকাশে ভাসমান মেঘের স্তরগুলির মধ্যে ঘর্ষণ হলে মেঘে এক প্রকার ইলেকট্রিক চার্জ জমা হয়। পৃথিবীর যে অঞ্চলের উপরে মেঘ খাড়াভাবে থাকে সেখানে বিপরীত ধর্মের চার্জ আবিষ্ট হয়। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠ ও মেঘের মধ্যে অতি বৃহৎ পরিমাণের ভোল্টেজ বা তড়িৎ চাপের সৃষ্টি হয়। বজ্রপাতের সময় মেঘের চার্জ যে পথে বাধা কম পায় সে পথে অতি দ্রুতবেগে তীব্র

আলোর ঝলকানি, প্রচণ্ড তাপ ও শব্দের সৃষ্টি করে ভূতলে প্রবেশ করে।

শব্দের বেগ বিদ্যুতের বেগের তুলনায় অতি নগণ্য। তাই বজ্রপাতের অনেক পরে শব্দ শোনা যায়। বাজ পড়ার সময় খোলা মাঠে কোন লোক থাকলে ভূপৃষ্ঠের উপর আবিষ্ট চার্জের একটি বৃহৎ অংশ লোকটির উপর সঞ্চিত হয়। এর ফলে মেঘের চার্জ লোকটির মাধ্যমে অতি সহজে পৃথিবীর পৃষ্ঠে আসে এবং লোকটির মৃত্যু ঘটায়। এসময় লোকটির মৃত্যু না ঘটলেও লোকটির নানা রকম গুরুতর ক্ষতি হতে পারে। যেমন (১) বিদ্যুতের প্রচণ্ড তাপে ঝলসে গিয়ে জ্ঞান হারাবে ও আতঙ্কে ভুগবে। (২) তীব্র আলোর ঝলকানিতে অন্ধ হতে পারে। (৩) শব্দের প্রচণ্ড চাপে কানের পর্দা ফেটে গেলে শ্রবণ শক্তি হারাবে। (৪) দেহের কোন অঙ্গের নার্ভ অকেজো হতে পারে এবং স্মৃতি শক্তি হারাতে বা কমে যেতে পারে।

উল্লিখিত অনিষ্টকর বিষয়গুলি বিবেচনা করলে বাজ পড়ার সময় খোলা মাঠে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়।

বহু সংস্কার আছে যেগুলোর পেছনে বৈজ্ঞানিক যুক্তি খাড়া করা যায়। তবে এখনো সেগুলোর বেশীর ভাগই পরীক্ষিত সত্য নয়।

শব্দের গতিবেগ কি বিদ্যুতের চেয়ে কম?

বিদ্যুতের গতিবেগের তুলনায় শব্দের বেগ নগণ্য বলেই ত' আমরা শব্দের ঝঙ্কার আগে পাই না। এই ঝঙ্কার আগে পেলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হওয়া থেকে সাবধান হওয়ার চেষ্টা করা যেতো। কিন্তু বিদ্যুৎ আগে আসে বলে আমরা চার্জ সহ্য করতে বাধ্য হয়ে পড়ি।

'বারো বছরে ফলে তাল, যদি না লাগে গরুর লাল', ঠিক কি?

'বারো বছরে ফলে তাল, যদি না লাগে গরুর লাল'—এই ধারণার পেছনে বিজ্ঞানীদের কেউ কেউ যুক্তি খাড়া করেছেন। তাঁরা বলেন হয়তো গরুর লালা লাগলে তালের ফলনে বিলম্ব হতে পারে। আর

এমনিতে বারো বছরে তাল ফলে। তাই বলা যায়—গরুর লালা না লাগলে ও বারো বছরে তাল ফলে।

পূর্ণিমা, অমাবস্যায় হলকর্ষণ করা ঠিক কি ?

পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় হলকর্ষণ করা অনুচিত—এটার পক্ষে অবশ্য কোন জোরালো যুক্তি পাওয়া যায় না। তবে পক্ষে বলা যেতে পারে এক একটা গাছ এক এক সময়ে পুঁতলে ভাল হয়। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় প্রাকৃতিক পরিবেশ একটু অন্যরকম থাকায় হয়তো সে সময় সুফল পাওয়া যায় না। কেউ বলেন হলকর্ষণ বন্ধের মাধ্যমেই প্রাণীদের মাঝে মধ্যে বিশ্রাম দেওয়া দরকার। এসময় বিশ্রাম পেলেই সবচাইতে ভাল হয়, কারণ পূর্ণিমা অমাবস্যায় শরীর খারাপের সম্ভাবনা যেন বেশী থাকে।

খাওয়া নিয়ে বিধি নিষেধ ঃ

খাওয়া নিয়েও নানারকম বিধি নিষেধ আছে। যেমন তৃতীয়ায় পটল, চতুর্থীতে মূলা, পঞ্চমীতে বেল, ষষ্ঠীতে লেবু, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে বেল ও মাংসাদি, নবমীতে লাউ, দশমীতে কলমীশাক, একাদশীতে শিম, দ্বাদশীতে পুঁই, ত্রয়োদশীতে বেগুন, চতুর্দশীতে মুসুরডাল ও মাংসাদি, অমাবস্যায় মাছ মাংস, প্রতিপদে কুমড়ো, পূর্ণিমাতে মাছ-মাংস খাওয়া নিষিদ্ধ। এরকমের পক্ষে যেমন বলা যায় বিপক্ষেও তেমনি বলা যায়। হয়তো ঐ ঐ সময়ে ঐ ঐ খাবার খারাপ থাকে বা হয়তো ঐ ঐ সময়ে ঐ ঐ খাবার ভালো হজম হয় না। তবে এ যুক্তি তেমন জোরালো মনে হয় না বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীর কাছে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যার কথা একটু আলাদা ভাবেই ভাবতে হয়। তবে ঐ সময়ে ঐ খাবার সত্যিই খাওয়া খারাপ কিনা তা জানতে হলে রীতিমত পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার। আর একজনের ক্ষেত্রে খারাপ হলেই খারাপ বলা চলবে না। খারাপ বলা হবে তখনই যখন বেশী লোকের ক্ষতি হবে।

‘ভাদ্র মাসের পর লাউ খাওয়া ঠিক নয়’—কেন ?

‘লাউ ভাদ্র মাসের পর খাওয়া ঠিক নয়’—এই ধারণার স্বপক্ষে বলা যায় ভাদ্র মাসের পর লাউ মোটেই ভালো থাকে না। সেইজন্যই খাওয়া ঠিক নয়। আরও কিছু খারাপ ফল আছে কিনা সে রকম কোন পরীক্ষিত সত্য জানা নেই বিজ্ঞানীদের। অনেকের ধারণা মঙ্গল শনিবারে বেগুন পোড়া খাওয়া ঠিক। এর স্বপক্ষে বিজ্ঞানীরা অবশ্য কোন জোরালো যুক্তি দেখাতে পারেন না।

রাতে ফল খাওয়া ঠিক কি ?

‘অনেকের ধারণা রাতে ফল খাওয়া ঠিক নয়’। কারো কারো মতে রাতে তেতো, টক, শাক খেতে নেই। বেশ কিছু ডাক্তারের মতে সত্যই রাতে ফল, টক, শাক, খাওয়া ঠিক নয়। পেটের রুগীদের ক্ষেত্রে এই বিধি নিষেধ বিশেষ করে প্রযোজ্য। কারণ টক ও শাক অম্বল ও গ্যাসের প্রধান তোরণ দ্বার।

‘পূর্ণ আষাঢ়ে যদি দক্ষিণের বাতাস বয় তবে বন্যা হয়’, ঠিক কি ?

আর একটি ধারণা—‘পূর্ণ’ আষাঢ়ে যদি দক্ষিণের বাতাস বয় তবে বন্যা হয় সেই বছরে’। বিজ্ঞানীরা এ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা অবশ্য চালান নি। তবে কিছু বিজ্ঞানীর মতে হয়তো পূর্ণ আষাঢ়ে দক্ষিণের বাতাস বইলে বেশী বৃষ্টি হবার সম্ভাবনা থাকে। কারণ যখন স্বপক্ষে বাতাস বয় এবং দক্ষিণের বাতাস একটানা অনেকদিন জলীয় বাষ্প বয়ে আনতে পারে, ফলে একটানা বৃষ্টি চলে। আর খুব বেশী বৃষ্টি হওয়া মানেই সাগর নদী ফুলে ফেঁপে উঠবে অর্থাৎ বন্যার সম্ভাবনা। তবে সঠিকভাবে এটা জানতে গেলে আরও চিন্তা ভাবনা করার দরকার আছে এ বিষয়ে।

বৃষ্টি অমঙ্গল সূচক !

বিভিন্ন নির্দিষ্ট সময়ে বৃষ্টি হওয়াটা খারাপ এ নিয়েও নানা

প্রচলিত ধারণা আছে। এটার পক্ষে কিছু বিজ্ঞানী যুক্তি খাড়া করেছেন। ঐ সময়ে বৃষ্টি হলে ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। ফলে দুর্ভিক্ষ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়।

ব্যাঙ ঘন ঘন ডাকলে শিগ্‌গিরই বৃষ্টি হয় কি ?

ব্যাঙ ঘন ঘন ডাকছে, 'শিগ্‌গিরই বৃষ্টি হবে' এরকম কথা অনেককেই বলতে শোনা যায়। এ ব্যাপারে কোন পরীক্ষিত সত্য নেই। তবে কিছু বিজ্ঞানীদের ধারণা—ব্যাঙেরা বৃষ্টি হবার আগে বুঝতে পারে। তাই তাদের ঘন ঘন ডাক শুনে কেউ যদি 'শিগ্‌গিরই বৃষ্টি হবে' বলে মতামত পোষণ করে তবে তার কথা সত্যি হবার সম্ভাবনাই বেশী।

তিলের সঙ্গে জিনের সম্পর্ক কি ?

তিল নিয়েও নানারকম সংস্কার আছে। কারো মতে 'ললাটের দক্ষিণ পার্শ্বে নাসার উপর তিল থাকলে দৈবধন ও যশোলাভের সম্ভাবনা'। এটার পক্ষে কোন জোরালো যুক্তি খাড়া করা যায়নি।

কারো মতে 'কর্ণ মধ্যস্থ তিল ভাগ্য ও যশের চিহ্ন'। কারো মতে গলায় তিল থাকলে গান সম্পর্কে ধারণা থাকে। কেউ বলেন, 'পেটে তিল থাকলে পেটুক হয়'। কারো মতে তিল হৃদয়ের ওপর অংশে থাকলে খুনী বা নৃশংস হয়। কেউ কেউ বলেন—'বুকের বাঁ-পাশে তিল থাকলে হৃদয়বান হয়।' তিলের ব্যাপারে কোন পরীক্ষিত সত্য নেই। তবে পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে ঠোঁটের তিল সম্পর্কে অন্যান্য ধারণাগুলোর কোন পরীক্ষিত সত্য জানা যায় নি। কিছু জেনেটিক্স-এর মতে তিলের সঙ্গে কিছু জিনের সম্পর্ক থাকতে পারে অর্থাৎ জিনের সঙ্গে মানুষটির আচার আচরণের কিছু সম্পর্ক থাকা স্বাভাবিক।

কুষ্ঠরোগ কি ছোঁয়াচে ?

কুষ্ঠরোগ আমাদের দেশে একটা বিরাট সমস্যা। সারা ভারতবর্ষে প্রায় তেত্রিশ লক্ষ লোক এই রোগে আক্রান্ত। আমাদের

পশ্চিমবঙ্গে এই রোগীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে চার লক্ষ কিন্তু সংখ্যা কেবল পরিসংখ্যানেই সীমাবদ্ধ নয়। আসল সমস্যার চেহারাটা ফুটে ওঠে এইসব রোগীদের উপর নির্যাতনের মধ্য দিয়ে, নির্মমতার মধ্য দিয়ে। বেশ কিছু রোগীকে প্রায় নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। অথচ এই রোগ সম্পর্কে যে ভয়াবহতার কথা ভাবা হয়েছে— তা মোটেই সত্যি নয়। কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে আমাদের ধারণা— কুষ্ঠরোগ ছোঁয়াচে। সব বিজ্ঞানী এখন একমত যে সব কুষ্ঠরোগই ছোঁয়াচে নয়। কুষ্ঠ সাধারণতঃ দুই প্রকারের হয়। সংক্রামক ও অসংক্রামক। আমাদের দেশে শতকরা কুড়ি ভাগ সংক্রামক রোগী। এদের সাহায্যেই শুধু কুষ্ঠ রোগ ছড়াতে পারে। তাও যদি সংক্রামক রোগীদের সঙ্গে কেউ দীর্ঘদিন বসবাস করে তবেই তার এ রোগ হতে পারে, অন্যথায় নয়। শতকরা আশি ভাগ কুষ্ঠরোগীই অসংক্রামক। সুতরাং কুষ্ঠরোগীদের দেখে সে রকম আতঙ্কিত হবার কিছু নেই। এই রোগ বীজানুঘটিত এবং দেহের চামড়ায় ও স্নায়ুগুলোতে এর ফলে ক্ষতি বেশী হয়। হাত ও পায়ের স্নায়ুগুলি অসুস্থ হবার ফলে হাত ও পায়ের অনুভূতি লোপ পায় ও ক্রমে অসাড় হয়ে পড়ে। 'কোনটা কুষ্ঠরোগ কোনটা নয়'—এ নিয়েও নানা সংশয় আছে অনেকের মনে। এই সংশয় যাতে না থাকে তার জন্য বিশেষজ্ঞরা বলেন সন্দেহ হলেই ডাক্তার দেখিয়ে নেওয়া ভাল। শুরুতে কুষ্ঠরোগ চামড়ায় একটি ঈষৎ বিবর্ণ দাগ হিসাবে দেখা দেয়, এই জায়গায় অনুভূতি কম থাকে এবং চিকিৎসা না হলে ক্রমশঃ বিবর্ণ দাগের পরিধি বাড়ে বা অন্যত্র এরকম দাগ ছড়িয়ে পড়তে পারে। 'বিবর্ণ দাগ দেখলেই কুষ্ঠরোগ হয়েছে' বলাটাও ঠিক নয়। ভাল করে ডাক্তার দেখিয়ে পরীক্ষা করে নিতে হয়।

সকালের রোদ্দুর গায়ে মাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল ?

ডাক্তাররা এর পক্ষেই রায় দিলেন। সূর্যরশ্মি সব সময়েই শরীরের পক্ষে ভাল। এর অভাবে বেশ কিছু চর্মরোগ দেখা দিতে

পারে। সুস্থ দেহে বেশীদিন বাঁচতে হলে সূর্যরশ্মি গায়ে লাগান একান্ত দরকার। তবে দুপুরের দিকে সূর্যের রশ্মির তেজ বাড়ে, ফলে গায়ের চামড়া কালো হয়ে যেতে পারে। এজন্য সকালের রোদ্দুর সবদিক দিয়ে মাখা ভাল। এ সময় সূর্যের তেজ তেমন থাকে না অথচ সূর্যরশ্মি গায়ে মাখার উপকারিতাটুকু পাওয়া যায়। তাছাড়া সকালের হাওয়া নির্মল থাকায় শ্বাস-প্রশ্বাসের পক্ষেও ভাল।

ভূমিকম্পের সময় একতলায় নেমে আসতে হয় কেন?

ভূমিকম্পের সময় দোতলা, তিনতলা থেকে একতলায় নেমে আসতে হয়, শাঁখ বাজাতে হয়—এরকম ধারণা অনেকের মধ্যেই চালু আছে। শাঁখ বাজানোর সঙ্গে ভূমিকম্পের কোন সম্পর্ক নেই। যে সমস্ত বিজ্ঞানী এর পক্ষে বলেন তাঁদের মতে শাঁখ বাজিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দেওয়া। আর দোতলা, তিনতলা থেকে নেমে এসে একতলায় আসাটা রীতিমত উচিত। কারণ যে সমস্ত বাড়ির গঠন মজবুত নয় সে সব বাড়ির উপরের অংশ ধসে পড়তে পারে। একতলা ধসার সম্ভাবনা সে তুলনায় কম। ফলে একতলায় নেমে আসাটাই সে সময় নিরাপদ।

মনের চিন্তার সাথে আত্মীয়দের দুর্ঘটনা মিলে যায় কি করে?

হঠাৎ মনে হ'লো নিকট কোন আত্মীয়ের দুর্ঘটনা হয়েছে, দেখা গেল সত্যিই সেই সময়ে সেই আত্মীয়ের কোন অমঙ্গল হয়েছে, এটার পিছনে কি যুক্তি খাড়া করা যায়? এর উত্তরে জনৈক বিজ্ঞানী বললেন, চিন্তা, ভাবনা, সমস্ত অনুভূতি আমাদের মাথাতে আসে। বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারে এক একটা অনুভূতি মাথার এক এক জায়গায় জাগে। এক একটা বিদ্যুৎ তরঙ্গের আকারও আলাদা আলাদা। অনুভূতি জোরালো হ'লে এই বিদ্যুৎ তরঙ্গগুলোর বহিঃপ্রকাশ হয় এবং বহুদূরে ছড়িয়ে পড়ে। রেডিওর তরঙ্গ ঘোরাতে ঘোরাতে যখন কোন নির্দিষ্ট তরঙ্গে দেওয়া হলো তখন সেই তরঙ্গে পাঠানো কথা

ধরা পড়লো সেই রেডিওতে। এমনি ভাবে যার দুর্ঘটনা হলো তার মনের বিদ্যুৎতরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে। দূরে বসে থাকা কোন আত্মীয়ের চিন্তার তরঙ্গ যখন এই তরঙ্গে আসে তখন দূরের সেই দুর্ঘটনায় পড়া আত্মীয়ের মনের তরঙ্গ ধরা পড়ে অর্থাৎ মনের আতঙ্কভাব ধরা পড়ে। এমনি ভাবে দূরের কোন আত্মীয়ের দুর্ঘটনা ঘটলে দূরে বসেই মনে সেটা ধরা পড়তে পারে। অবশ্য এ নিয়ে এখনও সে রকম কোন উল্লেখযোগ্য বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা হয়নি।

ঝড়, বৃষ্টি এবং বজ্রপাতের সময় বাড়ির বৈদ্যুতিক সুইচ খুলে রাখা উচিত কি উচিত নয় ?

বিজ্ঞানীরা অবশ্য বলেন—ঝড়বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময় বাড়ির বৈদ্যুতিক সুইচ বন্ধ করাই ভাল। বিদ্যুৎ চমক মানেই একটা বৈদ্যুতিক তরঙ্গ। এই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ সুইচ খোলা রাখলে তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। অন্ততঃপক্ষে তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুৎ তরঙ্গের পরিবর্তন আসাটাই স্বাভাবিক। তার ফলে বাল্‌ব কেটে যেতে পারে। কারণ প্রতিটি বাল্‌বেরই একটা নিজস্ব সহ্যক্ষমতা থাকে। অর্থাৎ সেই সহ্য ক্ষমতার এদিক ওদিক হলেই অর্থাৎ কম বেশী হলেই তার মৃত্যু হতে বাধ্য। হঠাৎ বজ্রপাত হলে এবং সেই সময়ে বাল্‌ব জ্বললে তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। সহ্য ক্ষমতার বেশী বিদ্যুৎ প্রবাহিত হলেই বাল্‌বের ভিতরের তার কেটে গিয়ে বাল্‌ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে। এর ফলে মিটারও খারাপ হয়ে যেতে পারে। বৈদ্যুতিক পাখাও অন্যরকম আচরণ করতে পারে। বজ্রপাতের ফলে যদি তারের মধ্যে প্রবাহিত বিদ্যুতের পরিমাণ সে রকম বেড়ে যায় তবে তার পুড়ে যেতে পারে। বজ্রপাতের ফলে তারের মধ্যে খুব বেশী বিদ্যুৎ হঠাৎ বেড়ে গেলে প্রচণ্ড চাপের সৃষ্টি হতে পারে। হঠাৎ বেশী চাপ সৃষ্টি হওয়ার ফলে তার যে দেওয়ালে আটকান থাকে সেই দেওয়ালে ফাটল

দেখা যেতে পারে। সুতরাং ঝড় বৃষ্টি বজ্রপাতের সময় প্রতিটি সুইচ বন্ধ করে রাখাই ভাল।

বজ্রপাতের সময়, ঝড়-বৃষ্টির সময় রেডিও খুলে রাখা ঠিক নয় কেন?

প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেন, না ঠিক নয়। তখন রেডিও বন্ধ রাখাই ভাল। যুক্তি অনেকটা আগের মতোই। বেশী বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয়ে রেডিওর বিভিন্ন তার পুড়ে যেতে পারে—রেডিওর ভিতরের অংশ ক্ষতি হতে পারে। সব চাইতে বড় কথা, অনেক দূর থেকে আসা শব্দতরঙ্গ ঝড়ের ফলে ব্যাহত হয় এবং ঘড় ঘড় আওয়াজ হয়, ভাল শোনা যায় না।

রেডিও জোরে চালালে ব্যাটারি বেশী খরচ হয়?

আর একটা সংশয় অনেকের মধ্যে দেখা দেয়—রেডিও জোরে চালালে কি বেশী ব্যাটারি খরচ হয়, না কম জোরে চালালে যে খরচ হয়, বেশী জোরে চালালেও একই রকম ব্যাটারি খরচ হয়—কোনটা ঠিক? বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ কিছু বিজ্ঞানী বললেন—বেশী জোরে রেডিও চালালে বেশী ব্যাটারি খরচ হওয়াই স্বাভাবিক। তার কারণ হিসেবে তারা যা বললেন তা অত্যন্ত জটিল।

সাধারণের বোঝার অসুবিধে আছে সে সব কথা। তবু কিছুটা না বললে ব্যাপারটা ভাল করে বোঝা যাবে না। রেডিওর শব্দ কম বেশী হওয়ার জন্যে রেডিওর এ্যামপ্লিফায়ার সারকিটই দায়ী। রেডিও অফিস থেকে পাঠান শব্দ 'ইলেক্‌ট্রোম্যাগনেটিক্‌' তরঙ্গের মাথায় চাপিয়ে পাঠান হয়। কেউ যখন রেডিও খুলে রাখে সেই নির্দিষ্ট তরঙ্গে, তখন তার রেডিওর এরিয়ালে সেই রকম বেতার তরঙ্গ ধরা পড়ে এবং রেডিওর ট্রান্সফরমারে উচ্চ কম্পনের স্পন্দন সৃষ্টি হয় এবং L-C বর্তনী নামে একটা বর্তনীর সাহায্যে ঐ স্পন্দন ট্রায়োডের গ্রীড-বর্তনীতে আরোপিত হয়। রেডিও থেকে যে তরঙ্গের মাথায় চাপিয়ে শব্দ পাঠানো হয়েছিল ট্রায়োডের সাহায্যে সেই

তরঙ্গ থেকে পাঠানো শব্দ পৃথক হয়ে পড়ে। ট্রায়োড বিবর্ধকরূপে কাজ করে।

$$\text{তাঁদের মতে বিবর্ধন ক্ষমতা} = \frac{\text{প্লেট ভোল্টেজের পরিবর্তন}}{\text{গাড়ি ভোল্টেজের পরিবর্তন}}$$

সুতরাং জোরে রেডিও চালাতে গেলে বিবর্ধন ক্ষমতা বেশী হলে ব্যাটারি খরচ বেশী হবে। সুতরাং রেডিও বেশী জোরে চালালে ব্যাটারি খরচ বেশী হবে। কম জোরে চালালে ব্যাটারি কম খরচ হবে।

সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা কি ঠিক নয়?

প্রচলিত আছে—সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা উচিত নয়। কেউ কেউ বিপক্ষে বলেন, কেউ বা পক্ষে। পক্ষে যে সমস্ত বিজ্ঞানী বলেন তাঁদের মতে—খাদ্যবস্তু ঐ সময় দূষিত হতে পারে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে দেখতে গেলে সূর্যগ্রহণ মানে চাঁদের ছায়া পৃথিবীর উপর এসে পড়ে। তাই আমরা পূর্ণ বা আংশিক সূর্যগ্রহণ দেখি। এই সময়ে সূর্যের আলো পৃথিবীর ঐ অংশে এসে পৌঁছতে পারছে না। জীবাণু ধ্বংসকারী এই আলো পৃথিবীতে আসতে না পারার জন্য খাদ্যবস্তু কিছুটা দূষিত হতে পারে। তাছাড়া, এই সময় সূর্য, পৃথিবী ও চাঁদ একই সরল রেখায় অবস্থান করে এবং চাঁদ পৃথিবীর খুব কাছে থাকে। সূর্যের প্রখর আলোতে চাঁদ থেকে কিছুটা বিষাক্ত বাষ্প বা ক্ষতিকারক বিকিরণও বেরিয়ে আসতে পারে, যেটা খাদ্যবস্তুকে দূষিত করতে পারে। সুতরাং সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গ্রহণ না করাই উচিত।

চন্দ্রগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু গ্রহণ করা কি ঠিক নয়?

চন্দ্রগ্রহণের সময় আবার পৃথিবীর ছায়া চাঁদের উপর পড়ে। এক্ষেত্রে অবশ্য বিষাক্ত বাষ্প বা ক্ষতিকারক বিকিরণ-এর সম্ভাবনা খুবই কম। সুতরাং এক্ষেত্রে খাদ্যবস্তু দূষিত হবার সম্ভাবনা খুবই

কম। তবে সূর্যগ্রহণের সময় খাদ্যবস্তু দূষিত হয়েছে এবং সেই খাবার খেয়ে কারও ক্ষতি হয়েছে—একথা ঐ বিজ্ঞানীদের জানা নেই। তবে সূর্যগ্রহণের সময় সূর্যের দিকে তাকিয়ে ক্ষতি হয়েছে—এরকম কিছু তথ্য পাওয়া গিয়েছে।

খাওয়া নিয়ে নানা সংস্কার, নানা বিধিনিষেধ আছে। এগুলো আমরা অন্ধের মত মেনে চলি। কেউ আবার জেদের বশে অগ্রাহ্য করে। অথচ আমরা একবারও ভেবে দেখবার চেষ্টা করি না সত্যিই সেটা মানা উচিত কিনা।

মাংস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া ঠিক নয় কি?

মাংস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া ঠিক কিনা—এ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেই বলে খেলেই পেট খারাপ। কেউ আবার বলেন 'ধ্যেৎ যত বাজে সংস্কার। কাল তো মাংসের পর দুধ খেলাম কিছুই হলো না আমার।' এভাবে চট করে সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক নয়। একবার কিছুই হ'লো না বলে মাংসের পর দুধ খাওয়া ঠিক—এরকম সিদ্ধান্তে আসাটা ঠিক নয়। হজমটা ব্যক্তিগত পরিপাক যন্ত্রের এবং খাওয়ার সময়ের শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে। অনেক গুরুপাক জিনিসও সহজে হজম হয়ে যায়। সাধারণভাবে বেশীর ভাগ ডাক্তারই বলেন—মাংস খাওয়ার পর দুধ খাওয়া ঠিক নয়। মাংস খাওয়ার পর দুধ খেলে হজম ও পরিপাক ঠিক হয় না। কারণ স্টমাকে হাইড্রক্লোরিক এ্যাসিড ক্ষরণ হয়, যা মাংসকে পাকস্থলীতে হজম হতে সাহায্য করে, তা দুধ খেলে কম বের হয়। সেইজন্য মাংস ঠিকমত পরিপাক হয় না এবং হজমের গোলমাল হয়।

রাতে কম খাওয়া ভাল কি?

অনেকের মতে রাতে কম খাওয়া ভাল। বেশীর ভাগ ডাক্তারের মতে রাতে কম খাওয়া উচিত। রাতে সাধারণতঃ লোকে ঘুমায়। ঘুমোবার সময় আমাদের মেটাবোলিজম্ কমে আসে। ফলে

এন্‌জাইম ও হজমে সুবিধার জন্য নিঃসারিত পাচক রসের পরিমাণ কমে যায়। সেজন্য হজমের সুবিধার জন্য রাতে অল্প খাওয়া ঠিক। শারীরিক পরিশ্রম বেশী হলে এন্‌জাইম ও হজমের জন্য নিঃসারিত পাচক রসের পরিমাণ বাড়ে।

কি ভাবে খাওয়া উচিত ?

দিনের বেলা কিছু না কিছু শারীরিক পরিশ্রম হয়। ফলে পাচকরস নিঃসরণের পরিমাণও বেশী থাকে দিনের বেলা। তাই দিনের বেলা বেশী খেলে ক্ষতি নেই। অবশ্য খুব বেশী খাওয়া ঠিক নয়। পাচক রসের সীমাবদ্ধতার কথা ভেবে একথা বুঝতে নিশ্চয় অসুবিধে হওয়া উচিত নয়। তাছাড়া বেশী খেলে বেশী খরচ তো হবেই। আর খাওয়াটা যেহেতু অভ্যাসের উপর নির্ভরশীল সেজন্য অল্প অল্প খেলে প্রথমে খিদে পাবে এবং অন্য অসুবিধে হবে ঠিকই তবে কিছুদিন বাদে এটা অভ্যাস হয়ে গেলে তখন আর কোনও অসুবিধে হবে না। পৃথিবীর একজন সেরা পুষ্টিবিদ্‌ তো দিনে মাত্র একবার খান। তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেছিলেন খিদেটা স্রেফ অভ্যাসের ব্যাপার। তাই দিনে একবার খেলেও তার কোন অসুবিধা হয় না। খিদে পায় না অন্য সময়। শরীরেরও ক্ষতি হয় না কিছু। কারণ শরীরের চাহিদা অনুসারে যত ক্যালরি খাদ্য খাওয়া দরকার—তা তিনি একবারেই খান। অবশ্য সবাই যে এভাবে একেবারে বেশী খেতে পারবে—এটা ভাবাটা ঠিক নয়। তাই তাঁরা দিনে দুবার তিনবার খেয়ে থাকেন। তাছাড়া যারা গ্যাসের রুগী তাদের তো বারে বারে অল্প অল্প করে খাওয়াই ঠিক, পেট একেবারে ফাঁকা রাখা উচিত নয় কখনোই।

কম খেলে কি স্বাস্থ্য ভাল হতে পারে না ?

একজন মানুষের কত ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা উচিত এ নিয়েও তর্ক-বিতর্ক আছে। বেশীর ভাগ ডাক্তারই এজন্য এক নির্দিষ্ট পরিমাণ

ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করতে বলেছেন। তবে আগেই বলছি সব জিনিসটাই অভ্যেসের ব্যাপার। তাই কম ক্যালরি খাদ্য খেলে শরীরের ক্ষতি হবে—এরকম ভাবাটাও ঠিক নয়। অভ্যেস করে নিলে খুব কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করেও অনেকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল থাকতে পারে। কারণ ওই একই। তাছাড়া মানুষের চেহারার একটা ছক তার দেহের কোষের জিনের মধ্যে থেকে যায়। তাই যার জেনেটিক চেহারা ভাল তার কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও চেহারা ভাল হয়। বেশীর ভাগ সাঁওতালের এজন্যই চেহারা ভাল হয়। এজন্যই কম ক্যালরি খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও অনেক দরিদ্র পরিবারে ভাল স্বাস্থ্যের মানুষ দেখা যায়।

খাওয়ার সময় জল খাওয়া ঠিক নয় কেন?

একটা সংশয় অনেকের মধ্যে দেখা যায়। খাওয়ার সময় বা ঠিক পরে জল খাওয়া ঠিক নয়—এ ধারণা অনেকের মধ্যেই আছে। আবার অনেকেই এ নিয়ম মানে না। তাঁদের মতে এর ফলে কোনই ক্ষতি হয় না শরীরের। তবে বেশীর ভাগ ডাক্তারের মতে খাওয়ার সময় বা পরে জল খাওয়া ঠিক নয়। সবচেয়ে ভাল সময় হ'লো খাওয়ার আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পর জল খাওয়া। খাওয়ার সময় জল খেলে পাকস্থলী থেকে নিঃসরিত হজমের পাচক রস নিঃসরণ লঘু হয়ে যায় এবং ভালভাবে হজম করতে পারে না। পক্ষান্তরে যদি খাওয়ার আধ ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা পরে জল খাওয়া যায় তবে এর মধ্যে খাদ্যগুলি ঘন পাচক রসে অনেকটাই হজম হয়ে যায়। তাছাড়া এই সময় হজমের জন্য অতিরিক্ত জলের প্রয়োজন হয়। এদিক থেকে খাওয়ার আগে জল না খেয়ে পরে খাওয়াই ভাল।

এক একটা বিষয় নিয়ে এক এক রকমের সংস্কার আছে। মানুষের দেহের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য তিল, মুখের গঠন, চোখের চেহারা, নাক-কানের আকৃতি, হাত-পায়ের আকার ও রেখাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে যেমন নানারকম ধারণা আছে, তেমনি নানারকম ধারণা রয়েছে

প্রকৃতির পূর্বাভাস নিয়ে, প্রকৃতির ও জীবনের নানা সম্পর্ক নিয়ে, বৃষ্টি নিয়ে এরকম নানা মত চালু আছে। বৃষ্টি বন্ধ হওয়ার জন্য যেমন নানা রকম সংস্কার আছে, তেমনি নানা সংস্কার রয়েছে বৃষ্টি আসা নিয়ে। বৃষ্টির স্থায়িত্ব নিয়েও নানারকম মতামত রয়েছে। এগুলোর বেশ কিছু কুসংস্কার। কিছু ধারণা আবার পরীক্ষা করে দেখতে হয় সত্যিই সেটা ঠিক কি না। কিছু আবার বর্তমান লেখকের পরীক্ষিত পরবর্তী সত্য। আমার কিছু কিছু ধারণা নিয়েই এবার আলোচনা করব।

মাঘের শেষে বৃষ্টি হওয়াটা ভাল কি?

প্রচলিত আছে—যদি বর্ষে মাঘের শেষ,
ধন্য রাজার পুণ্য দেশ।

খনার বচন এটা। এই ধারণার স্বপক্ষে বেশ কিছু কৃষি-বিজ্ঞানীর রায়। মাঠে ধান ওঠার পর বৃষ্টি হলে চাষের জন্য মাঠ কর্ষণ করতে পারে। তার ফলে মাটি ভালভাবে পরবর্তী চাষের জন্য প্রস্তুত করতে পারে। মাঠে যদি পূর্ব-চাষের রোগ বা পোকার আক্রমণ থাকে তাহলে এই কর্ষণের দ্বারা পোকার ডিম ও বাসা নষ্ট হয় এবং ধান গাছের গোড়াও পচে যায় এবং জমির উর্বরাশক্তি বাড়ায়। মাটির ভেতরে জল প্রবেশের ক্ষমতা বাড়ায়, তার ফলে জমি সরস থাকে। সূর্য্যের কিরণ মাটিতে ভালভাবে প্রবেশ করে। মাটির উপকারী জীবাণুর কাজ ভাল হয়। মাটির অবক্ষয় হওয়া ঝড়ের ও বৃষ্টির দ্বারা বন্ধ হয় এবং মাটির উর্বরা শক্তির ক্ষতি হওয়া বন্ধ হয়। আম, জাম, লিচু, পেয়ারা, সফেদা, লেবু, কলা ও পেঁপের ফলন বাড়ায়।

শীতকালীন সব্জী-চাষও মাঘের শেষে বৃষ্টি হলে ভালই হয়। ধান (বোরো), গম, সরষে, সূর্যমুখীর চাষও ভালই হয়। যে সমস্ত বাতাসে রোগের জীবাণু আকাশে ঘুরে বেড়ায় বৃষ্টির ফলে তারা নিচে নেমে আসে ও দমন হয় তাদের। ছোট ছোট জলাশয়ে এসময় অনেকটা জল কমে যায়। মাঘের শেষে বৃষ্টি হলে জলাশয়গুলো আবার জলে ভর্তি হয়। ফলে মাছের চাষের সুবিধে হয়। কৃষকরাও

ঐ জলে অন্যান্য চাষ করতে পারে। কিছু বিজ্ঞানী একটা মজার কথা বলেন। তাঁদের মতে গ্রাম বহুল দেশে খড়ের ঘর বেশী, তাই আগুনের ভয় থাকে ঐ সব ঘরে। বৃষ্টি হলে কিছুদিন ঐ সব ঘরের বাসিন্দারা আগুনের হাত থেকে নিশ্চিন্ত হতে পারে।

শরতে বৃষ্টি হওয়া ভাল কি?

'শরতে বৃষ্টি হওয়া ভাল' এর পক্ষে বেশ কিছু রায়, কিছু বিজ্ঞানী অবশ্য কিছু খারাপ ফলের কথাও বলেন। শরতে অর্থাৎ ভাদ্র-আশ্বিন মাসে বৃষ্টি হ'লে ধানগাছের পক্ষে মধুবর্ষণ বলা যেতে পারে, কারণ এই সময় ধান গাছের বৃদ্ধির সময়। তাই যদি রাত্রিতে বৃষ্টি হয় এবং দিনে রৌদ্র পায় তাহলে সূর্যের কিরণের সাহায্যে গাছ তার শরীরের পুষ্টি সাধন করতে পারে এবং বৃষ্টি রাত্তিরে হলে সারাদিন মেঘলা থাকে না। তাই সূর্যের কিরণ ভালভাবে পেলে রোগপোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা পায়। কিছু বিজ্ঞানী ভাদুরে গরমের কথা ভেবে বললেন—ভাদ্র ও আশ্বিন মাসে যে গরম অনুভব হয় তাও এ-সময়ের বৃষ্টির ফলে কম থাকে। মাছ চাষের জন্য এ-সময় প্রচুর জলের দরকার। তাই মাছ চাষেরও সুবিধা হয়। যে জল বয়ে যায় তাতে প্রচুর অক্সিজেন বাহিত হয়। তাই ফসলের বৃদ্ধি হয় ভাল। বৃষ্টির সাথে বাতাসের নাইট্রোজেন নেমে আসে এবং মাটিতে মিশে যায়। নাইট্রোজেন গাছের একটা প্রধান খাদ্য। গাছ মাটি থেকে এই নাইট্রোজেন টেনে নেয় শিকড়ের সাহায্যে। তাই শরতের বৃষ্টি গাছের পক্ষে বিশেষ করে ধানগাছের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। পাট এই সময় কাটা হয়। তাই এটার পচাবার জন্যে জলের দরকার, প্রবাহিত জলে পাটের রঙ ভাল হয় এবং চাষী পাটের বাজারদর ভাল পায়। ভাল বৃষ্টি এই সময় হলে চাষী পাট কেটে ঐ জমিতে আরও একটা ধানের চাষ করতে পারে।

অঘ্রাণে বৃষ্টি হলে দুর্ভিক্ষ হয়, ঠিক কি?

'অঘ্রাণে বৃষ্টি হলে দুর্ভিক্ষ হয়' এটাও একটা প্রচলিত ধারণা।

বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী এর পক্ষেই বললেন। অগ্রহায়ণ মাস হেমন্ত কাল। সেই সময় আমাদের দেশে যেটাকে হৈমন্তিক ধান বলে—সেটা কাটা হয়। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম সপ্তাহের পর থেকে কাটা শুরু হয়। মাঠ পাকা ধানে ভরপুর হয়ে থাকে। ঐ সময় বৃষ্টি নামলে যে ধান মাঠে কাটা হয়ে পড়ে থাকে—তা নষ্ট হয়ে যায়। খড়গুলিও পচে যায়। ধানই আমাদের আসল ফসল তাই ধানের ক্ষতি মানে বিরাট ক্ষতি। ধানের সে রকম অভাব হ'লে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলেও দিতে পারে। এ সময় যে সমস্ত শীতকালীন সব্জী আলু, গম, ইত্যাদি চাষের জন্য বীজ বসানো হয় তা বেশী বৃষ্টিতে পচে নষ্ট হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, যদিও কিছু গাছ হয় তাও এদিক ওদিক ছড়ানো ছেটানো। তাই এগুলো থেকে ফসল সংগ্রহের অসুবিধা থাকে। কাউকে আবার নতুন করে বীজ বুনতে হয়। এইভাবে ফসলের নষ্ট হওয়ায়, মূলত ধানের ব্যাপক ক্ষতি হলে দুর্ভিক্ষ দেখা দিতেই পারে। মানুষ এ সময়ের বৃষ্টির ফলে বেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়—এটা অন্ততপক্ষে বলা যায়।

কিছু কিছু সংস্কারকে কু বলেই মনে হয়। তবে সিদ্ধান্তে আসতে গেলে পরীক্ষা নিরীক্ষার প্রয়োজন। বিজ্ঞানীদের এ কাজে বেশী করে এগিয়ে আসতে হবে। বর্তমান লেখকেরও এ ব্যাপারে কাজ আছে।

'গর্ভবতী মেয়েদের এলোচুলে শনি / মঙ্গলবারে যত্রতত্র যেতে নেই' ঠিক কি?

সংস্কার আছে গর্ভবতী মেয়েদের এলোচুলে শনি / মঙ্গলবার যত্রতত্র যেতে নেই। এটাকে কুসংস্কারই বলা যায়। কারণ গর্ভবতী মেয়েদের যাওয়ার সঙ্গে এলোচুলের কোন সম্পর্কই থাকতে পারে না। তবে এর স্বপক্ষেও কিছু বলা যায়। গর্ভবতী মেয়েদের সবসময় চোট খাওয়া থেকে সাবধান থাকতে হয়। কারণ পড়ে গেলে বা আঘাত লাগলে পেটের বাচ্চারও সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা। যত্রতত্র যখন তখন যাওয়া ঠিক নয়।

'খাওয়া নিয়ে কিছু সংস্কার'

জৈষ্ঠ্য মাসের ছেলের মা লাউ বা বেল খায় না। এর বিপক্ষে যেমন বলা যায় স্বপক্ষেও তেমনি বলা যায়। হয়ত ঐ সময় বেল বা লাউ খাওয়া শরীরের পক্ষে খারাপ। হয়ত ঐ সময় বেল বা লাউ খাওয়ার উপযুক্ত থাকে না। মাঘ মাসে মূলা খায় না; চৈত্র মাসে শিম খায় না। এর স্বপক্ষে বলতে গেলে ঐ একই রকম যুক্তি দেখাতে হয়। তবে এর উপরে এখনও সেরকম কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়নি। তাই বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই এ-ব্যাপারে চট করে কোন সিদ্ধান্তে আসতে চাননি। তবে ত্রয়োদশীতে বেগুন খাওয়া ঠিক নয়। এটা কুসংস্কার বলেই মনে হয়।

'এক গোত্রের মধ্যে বিয়ে হওয়া ঠিক নয়'—ঠিক কি?

এক গোত্রের মধ্যে বিয়ে হওয়া ঠিক নয়—এ ধরনের একটি সংস্কার। যারা পক্ষে বলেন তাঁদের মতে—সন্তান পিতার অর্ধেক জিন পায় আর মাতার অর্ধেক জিন পায়। এরাই জোড়ায় জোড়ায় থেকে সন্তানের বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করে। তাই এক গোত্রের হলে এই জিনের জোড়াগুলি ভাল হয় না। ফলে সন্তান উন্নত ধরণের হতে পারে না। বিপক্ষ বিজ্ঞানীরা অবশ্য এ যুক্তি মানেন না।

নিকট আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে যুক্তিসঙ্গত নয়!

নিকট আত্মীয়র মধ্যে বিয়ে যুক্তিসঙ্গত কিনা এ প্রশ্নের উত্তরে অবশ্য বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই বলেন নিকট আত্মীয়র মধ্যে বিয়েটা না হওয়াই ভাল। একটা জাতের মধ্যে এ ধরনের বিয়ের সংখ্যা দু' একটা হলে অবশ্যে ক্ষতি হয় না, তবে সেই জাতের মধ্যে এ'টা নিয়ম হ'লে খারাপ ফল পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। 'টোডা' বলে একরকম একটা সম্প্রদায় নিশ্চিত ধ্বংসের দিকে এগিয়ে চলেছে। এদের মধ্যে এক ধরনের জিনের অভাব দেখা যায় যা ফার্টিলিটির জন্যে দায়ী। এদের মধ্যেই বিয়ে সীমাবদ্ধ থাকায় এ-ধরণের জিনের সম্ভার সমৃদ্ধ হতে

পারছে না সন্তান সন্ততিদের মধ্যে। তবে আমার মতে কোন জাতের বেশির ভাগ বৈশিষ্ট্যই যদি ভাল হয় এবং ভাল ফার্টিলিটির জন্যে দায়ী জিন যদি বেশীমাত্রায় থাকে তাহলে নিকট আত্মীয়দের মধ্যে বিয়ে খারাপ না হয়ে ভালই হবে। তবে এবিষয়ে আরও গবেষণার প্রয়োজন।

জন্ম মুহূর্তের গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থানের সঙ্গে মানুষের জীবনের কি সত্যিই কোন সম্পর্ক আছে?

বেশ কিছু লোকের বিশ্বাস এদের মধ্যে সম্পর্ক আছে। এর ফলেই ঠিকুজি ইত্যাদি করার চলন আছে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী এমতে বিশ্বাসী। তাঁদের মতে আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, অভিকর্ষ ইত্যাদির আমাদের জীবনে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে, আমাদের জীবন মানে কতকগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার সমষ্টি। আর প্রত্যেকটি রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপরে আলো, শব্দ, তাপমাত্রা, অভিকর্ষ বল ইত্যাদির প্রভাব রয়েছে। পাখী ও অধিকাংশ প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আলো চোখে প্রবেশ করে হাইপোথ্যালিশমাম নামে একটা গ্ল্যাণ্ডকে উত্তেজিত করে এবং তার ফলে রিপ্রোডাকটিভ গ্ল্যাণ্ডও উত্তেজিত হয়। ফলে গ্রীষ্মপ্রধান দেশে জন্মের হার বেশী।

এক একরকমের আলোতে মেজাজও এক একরকম হয়। পাটল বর্ণের ফ্লুরোসেন্ট আলোতে বেশীদিন থাকলে মেজাজ খিটখিটে হতে বাধ্য। আবার সাদা রঙের আলোতে বা নীল আলোতে মেজাজ ঠাণ্ডা হতে বাধ্য। প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, সেক্স নির্ণয়েও আলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। এটাই প্রমাণিত হয়েছে নীলাভ আলো পেলে বেশীর ভাগ মেয়ে জন্মায় আর গোলাপী বর্ণের আলোতে সাধারণতঃ ছেলেই বেশী জন্মায়। দীর্ঘ আয়ুর উপরও আলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। ডক্টর অট্ বলে একজন বিদেশী বিজ্ঞানী দেখিয়েছেন সাদা ঠাণ্ডা ফ্লুরোসেন্ট আলোতে যে ইঁদুরগুলো জন্মায়, তারা অন্যান্য

ইঁদুরগুলোর চাইতে অর্ধেক বাঁচে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের ইঁদুরগুলো হয়ত বেশী বাঁচে এই কারণেই।

এমনিভাবে বেশী গোল-মেলে শব্দ মেজাজ খিটখিটে করে। আয়ু কমিয়ে দেয়। অভিকর্ষ বলেরও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে জীবনে। বিভিন্ন গ্রহ-নক্ষত্র থেকে আসা আলো, অভিকর্ষজ বল ইত্যাদির প্রভাব তাই জীবনে থাকতেই পারে। তবে আমার মতে জীবনে এই নিয়ন্ত্রণ সূর্য, চাঁদেরই বেশী। তবে এক সময়ে জন্ম নেওয়া দুই মানুষের উপরে সূর্য, চাঁদ ইত্যাদির প্রভাব সমান হওয়াই স্বাভাবিক।

সংস্কারের কিছু কিছু স্রেফ কুসংস্কার বলে উড়িয়ে দেওয়া যায়। কিছু কিছু সংস্কার অবশ্য পরীক্ষা-নির্ভর হয়ে পড়ে আছে। সেগুলো পরীক্ষিত সত্য নয়, তবে তাদের স্বপক্ষে কারণ দেখানো যেতে পারে। কিছু কিছু অবশ্য পরীক্ষিত সত্য যার ফলাফল জনসাধারণের জানা নেই। আমরা এবার দ্বিতীয় ও তৃতীয় ধরণের কিছু ধারণা নিয়ে আলোচনা করব।

‘পুকুরে স্নান করা—মাছের বৃদ্ধির অনুকূল’—ঠিক কি?

প্রচলিত আছে—যে পুকুরে মাছ আছে সেই পুকুরে স্নান করলে মাছের বৃদ্ধি ভাল হয়। কেউ কেউ বলে থাকেন ‘যে পুকুরে মাছ আছে সেই পুকুরে স্নান করা উচিত, পুকুরের জলে স্নান করাটা পুকুরের জলের অবস্থার উপর নির্ভর করছে, মাছের উপস্থিতির উপর নয়। জল যদি বদ্ধ না হয় অর্থাৎ যদি সূর্যের আলো তার উপরে পড়ে এবং অপরিষ্কার বা ঘোলা না হয় তবেই স্নান করা বিধেয়। অর্থাৎ পরিষ্কার জলে স্নান করা উচিত। পুকুরের জলে যদি মাছ থাকে তাহলে পুকুরের জলে স্নান করলেই জলের মধ্যে সাময়িক আলোড়ন হয় সেটা মাছের পক্ষে অত্যন্ত ভাল। জলে ঢেউ উঠলে মাছেরা ইতস্তত: ছোটাছুটি করে যা নাকি মাছের পক্ষে ভাল। জাল ফেললেও মাছের গায়ে জাল লাগে এবং মাছেরা ছোটাছুটি করে। আসলে মাছেরা বা যে কোন প্রাণীর দেহের বৃদ্ধি যে পদ্ধতিতে

হয় সেই পদ্ধতি সেই রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলির তাপমাত্রা, আলোর রঙ, খাবারের ধরণ, খাবারের পরিমাণ, কোন শব্দের ধরন, দৈহিক পরিশ্রম ইত্যাদি নানা কারণের উপর নির্ভরশীল। স্থির জলে মাছের দৈহিক পরিশ্রম বেশী হয় না। তাই পুকুরের জলে স্নান করতে নামলে মাছেরা ভীত হয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়, ফলে তাদের দৈহিক পরিশ্রম ঠিকমত হয়। ঠিকমত বললাম কারণ পরিশ্রম বা খাদ্যগ্রহণ ঠিক পরিমাণের চাইতে বেশী হ'লে বৃদ্ধি সেরকম উল্লেখযোগ্য হয় না। তাই সব সময়ে পুকুরে স্নান করা বা সব সময়ে পুকুরের জল নাড়ানোও ঠিক নয়। তবে রাত্তিরে সাধারণতঃ পুকুরের জল স্থির থাকে, তাই দিনের বেলা একটু বেশী স্নান করলেও মাছের বৃদ্ধি ভালই হয়।

'বাবা মার স্বাস্থ্য ভাল হ'লে সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হবে' ধারণাটা ঠিক কি?

কিছু বিজ্ঞানী বলেছেন—বাবা মার দৈহিক ও চারিত্রিক গুণ-গুলোই সন্তানের মধ্যে আসে জন্মসূত্রে। এটা একটি বংশগত ব্যাপার কিন্তু বাবা মার স্বাস্থ্য ভাল হলেই সন্তানের স্বাস্থ্য ভাল হবে—একথা সব সময় সত্যি নাও হতে পারে। সন্তান জন্মগ্রহণের পর তার স্বাস্থ্যের ভাল মন্দ নির্ভর করে আরও কিছু কারণের উপর। সন্তানের ভাল স্বাস্থ্য নির্ভর করে সুষম খাদ্য, অঙ্গ সঞ্চালনের ধরণ এবং রোগের জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হওয়া না হওয়ার উপর।

সন্তান যে পরিবেশে বড় হয় সেই পরিবেশের উপরও সন্তানের দেহের বৃদ্ধি নির্ভরশীল, অর্থাৎ সন্তানের স্বাস্থ্য বাবা মার থেকে আহৃত গুণাবলীর উপর এবং খাদ্যগ্রহণ, খাদ্য, পরিবেশ ইত্যাদির উপরও নির্ভরশীল। তবে লম্বা বেঁটে ইত্যাদি কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সন্তান তার পূর্বপুরুষের জিন মারফত সংগ্রহ করে নেয়। তাই ভাল স্বাস্থ্যের নীরোগ সন্তান কেবল মাত্র বাবা মার স্বাস্থের উপর নির্ভর-শীল নয়।

গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খাওয়া ঠিক কি ?

'গরম থেকে এসে ঠাণ্ডা জল খেতে নেই' এরকম নিষেধ অনেককেই বলতে শোনা যায়। গরমের মধ্যে থেকে চলাফেরা বা ছোটাছুটি করে এলেই শরীরের মধ্যে তাপের আধিক্য ঘটে, ঘাম নির্গত হয়, রক্ত সঞ্চালন দ্রুততর হয়, শ্বাস-প্রশ্বাসের হার কিছুটা বাড়ে। তাই গরমের মধ্যে থেকে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলে শরীরের ভিতরের বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি ধীরে ধীরে স্বাভাবিক হয়ে আসে এবং শরীরের তাপমাত্রা পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে। তখন জল খেলে ক্ষতি হয় না। কিন্তু যদি গরম থেকে এসেই কিছুটা জল খাওয়া যায় তাহ'লে শরীরের ভিতরের এবং বাইরের তাপমাত্রার হেরফের হওয়ায় হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগা, বিষমলাগা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই সর্বদাই গরম থেকে এসে কিছুক্ষণের জন্য শরীরকে বিশ্রাম দিয়ে তার পর ঠাণ্ডা পানীয় পান করা উচিত এটাই সব বিশেষজ্ঞের মতামত।

শোবার আগে বা ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়া ভাল কি ?

শোবার আগে বা ঘুম থেকে উঠে জল খাওয়া ভাল—এটাও একটা প্রচলিত ধারণা। এই ধারণার স্বপক্ষেই সব বিশেষজ্ঞরা বলেন। আমাদের শরীরে জলের অত্যন্ত প্রয়োজন। খাওয়ার অনেক পরে বিশেষতঃ শোবার আগে বেশ কিছুটা জল খাওয়া হজমের পক্ষে ভাল। পর্যাপ্ত জল পাকস্থলীতে থাকলে খাওয়ায় যদি কোন অম্ল বা বিষাক্ত কিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে তাকে জলের মাধ্যমে কিছুটা লঘু করা সম্ভব। তা ছাড়া হজমের ব্যাপারেও সুবিধা হয়। সকালে ঘুম থেকে উঠেই কিছুটা জল খেলে পাকস্থলীতে জলের আধিক্য হওয়ায় ভিতরের অংশ ধোওয়া বা পরিষ্কার হয়ে ধীরে ধীরে মলমূত্রের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। তাছাড়া সকালে ঘুম থেকে উঠেই জল খেলে মলমূত্রের জন্য চাপ সৃষ্টি হয় ও ভালভাবে পরিষ্কার হয়। খাদ্যে কোনরকম বিষক্রিয়া ঘটলে পাকস্থলীর মধ্যে জলের পরিমাণ বেশী হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়, তাছাড়া যে কোন সুস্থ মানুষেরই উচিত বিভিন্ন

সময়েই অনেকটা করে জলপান করা। শরীরের বিভিন্ন বর্জনীয় পদার্থ বেরিয়ে গিয়ে শরীরকে সুস্থ রাখার চেষ্টা করে। এর ফলে কোষ্ঠ-কাঠিন্য দূর হয়। পায়খানা ভাল হয়। ক্ষুধামন্দও দূর হয়। সে জন্যই সকালে ঘুম থেকে উঠে বা রাত্রে শোবার আগে অনেকেই জলপান করেন এবং তা শরীরকে সুস্থ রাখে ও শরীরকে ভাল করে।

খাবারের পুষ্টিমূল্য বাড়ানো সম্ভব?

দারিদ্র্য বা অজ্ঞতার দরুন যারা যথেষ্ট পরিমাণে পুষ্টিকর খাদ্য পায় না তাদের পুষ্টি যোগাবার জন্য আজকাল বিভিন্ন দেশে একটি সহজ পন্থা গ্রহণ করা হয়, ইংরাজিতে এই পন্থার নাম হচ্ছে 'ফুড ফরটিফিকেশন' অর্থাৎ খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধি। খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধির দুটি উপায়—(১) কোন খাবারের মধ্যে যে প্রোটিন বা ভিটামিন বা খনিজদ্রব্য অল্প পরিমাণে আছে সেগুলি কৃত্রিম উপায়ে বাড়িয়ে তোলা। (২) কোন খাবারের মধ্যে যে ভিটামিন, প্রোটিন বা খনিজ পদার্থ নেই সেটা কৃত্রিমভাবে খাবারের মধ্যে যুক্ত করে দেওয়া। দ্বিতীয় উপায়টির নাম এনরিচমেণ্ট।

আমেরিকা, ইংল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি উন্নত দেশ তো বটেই এমন কি থাইল্যাণ্ডের মতো দেশেও আজকাল এইভাবে খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বাড়ানো হচ্ছে। সে সব খাদ্যের (এবং পানীয়ের) পুষ্টিমূল্য এভাবে বাড়ানো হচ্ছে সেগুলির মধ্যে আছে চাল, ময়দা, রুটি, বিস্কুট, সুপ, কোকো, কফি, চা, অরেঞ্জ ও জুস প্রভৃতি।

এমন কি পানীয় জলের 'ফরটিফিকেশন'-এরও দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল কোথাও কোথাও পানীয় জলের সঙ্গে সোডিয়াম ক্লোরাইড মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বস্তুটি দাঁত ও হাড়ের জন্য বিশেষ প্রয়োজনীয়।

এই 'ফুড ফরটিফিকেশন' পদ্ধতি ভারতবর্ষের মানুষদের কাছে অত্যাবশ্যক পুষ্টি পৌঁছে দেওয়ার পক্ষে একটি বিশেষ উপযোগী

পদ্ধতি অবশ্য যদি সেটা সুপরিকল্পিত ভাবে প্রয়োগ করা হয়। দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা পুষ্টিহীনতার এই দুই কারণই ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষের পক্ষে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। এই মানুষগুলির কাছে পরিপূরক খাদ্য পৌঁছে দেওয়া ব্যয়সাধ্যও বটে বা অসুবিধাজনকও বটে। তার চেয়ে বরং তাদের অভ্যস্ত খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বাড়ানো অপেক্ষাকৃত সহজ হতে পারে।

ভারতবর্ষের খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বাড়ানোর ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে অতি সম্প্রতি। লাইসিন (একজাতের প্রোটিন) ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ যুক্ত পাঁউরুটি তৈরী করার জন্য সারা দেশে আটটি রাষ্ট্রীয় বেকারী স্থাপন করা হয়েছে।

আমাদের দেশে এখন পর্যন্ত খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধির যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে তার ত্রুটি এই যে, জনসাধারণের যে অংশকে পুষ্টিকর খাদ্য যোগাবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী সেই অংশকে এই কর্মসূচীর দ্বারা স্পর্শ করা যাচ্ছে না। গ্রামের মানুষ ও দরিদ্রতর মানুষরা পাঁউরুটি খান না। কাজেই পুষ্টিকর পাঁউরুটি তাঁদের কোন কাজে লাগবে না।

পুষ্টিকর পাঁউরুটি শিশুদের কাজে আসবে না। আমরা জানি, মানুষের মস্তিষ্কের ৯০ শতাংশই তৈরী হয়ে যায় জীবনের প্রথম চার বছরে। প্রোটিনের অভাবে শিশুকালেই যদি মস্তিষ্কের বিকাশ ব্যাহত হয় তাহলে সেই ক্ষতি পরবর্তীকালে আর পূরণ করা যায় না, সেদিক থেকে খাদ্যের পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা আমাদের দেশে গ্রহণ করা হয়েছে তার উপযোগিতা একান্তই সীমাবদ্ধ।

এগুলি স্থাপিত হয়েছে অষ্ট্রেলিয়া ও কানাডা সরকারের সাহায্যে, নবম বেকারী আরও একটি স্থাপন করার কথা আছে। বেকারীগুলিতে চল্লিশ হাজার টন রুটি তৈরী হচ্ছে এবং দশ হাজার বা তার বেশী লোক শহরে বাস করেন–এমন শহরগুলিতে ঐ সব রুটি সরবরাহ করা হচ্ছে।

দাবী করা হচ্ছে যে খাদ্যে পুষ্টিমূল্য বৃদ্ধির বড় বড় কর্মসূচী আজ পর্যন্ত পৃথিবীর অন্য কোন দেশে গ্রহণ করা হয়নি।

'ফুড ফরটিফিকেশন'-এর অন্যান্য যে সব দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে আছে সেগুলির মধ্যে বনস্পতির সঙ্গে 'এ' ভিটামিন যোগ করার কথা উল্লেখ করা যায়। তাছাড়া হিমালয়ের পাদদেশে কোন কোনও জায়গায় আয়োডিন মিশ্রিত লবণ সরবরাহ করে এইসব এলাকায় গলগণ্ড রোগের প্রকোপ দমন করা সম্ভবপর হয়েছে। এটা একটা পরিচিত সত্য যে খাদ্যে আয়োডিনের অভাব হলেই গলগণ্ড রোগ হবার সম্ভাবনা থাকে।

পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে, চালের গায়ে থায়ামিন রিবোফ্লোবিন ও নিকোটিনিক অ্যাসিড স্প্রে করে এবং তার উপর গরম জলে দ্রবীভূত হয় এমন একটা আস্তরণ দিয়ে চালের ভিটামিন-মূল্য বাড়ানো যায়। সাধারণ চাল ধুলে যেমন তার গা থেকে ভিটামিন বেরিয়ে যায়, বিশেষভাবে প্রস্তুত এই চালের বেলায় তা হয় না।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই ধরণের বিশেষভাবে প্রস্তুত চালের রঙ হলদে হয় এবং গৃহিণীরা সেটা পছন্দ করেন না। তবে যদি এই অসুবিধা দূর করা সম্ভবপর হয় তাহলে একদিন হয়তো পুষ্টিকর রুটির মতো পুষ্টিকর চাল যোগাবারও একটা বৃহৎ কর্মসূচী ভারতবর্ষে গ্রহণ করা যাবে।

সাপে কামড়ালে ঃ আগুনে পুড়লে ঃ জলে ডুবলে প্রাথমিক ব্যবস্থা কি ?

সাপে কামড়ালে—বিজ্ঞান এখন যথেষ্ট উন্নত হওয়ায় সাধারণ ব্যাপারগুলো আমাদের জানতে হবে বিজ্ঞানের আলোয়। জানতে পারলে অনেক বিপদ আমরা নিজেরাই প্রাথমিকভাবে সামাল দিতে পারব।

যেমন সাপে কামড়ালে কি হয়, কি করতে হয় তা এখন

অনেকেরই জানা, সাপের বিষ রক্তে ঢুকলে সেই বিষ রক্তের হিমো-গ্লোবিনের হিম এবং গ্লোবিনকে ভেঙ্গে দেয়। এর ফলে রক্তে হিমোগ্লো-বিনের সাহায্যে অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে না। মানুষটি মারা যায় অক্সিজেন গ্রহণ না করতে পারার জন্য। সাপে কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গে তাই কোন কোন জায়গায় বাঁধন দিতে হবে তা আজ অনেকেরই জানা। জয়েন্টগুলোতে বাঁধন দিলে রক্তের বিষ যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না অন্য অংশে তা আজ আর কাউকে বলে দিতে হবে না।

আগুনে পুড়লে—কারো জামা, কাপড়ে আগুনে লাগলে যে কোন বস্তা বা মোটা কম্বল, চাদর, তার গায়ে চাপা দিলে বাতাসের অক্সিজেনের অভাবে আগুন নিভে যায় এটাও আজ অনেকেরই জানা। তবুও এই প্রাথমিক চিকিৎসাগুলো আরও ভালো করে জেনে নেওয়া ভালো।

জলে ডুবলে—কেউ জলে ডুবলে তাকে জল থেকে তুলে কিভাবে চিৎ করে শুইয়ে কোমর থেকে হাত দিয়ে মালিশ করতে করতে ক্রমশঃ উপরে হাতকে তুলে মুখ দিয়ে ভেতরে ঢোকা জল বের করা যায় এগুলোও আরও সঠিকভাবে জানতে হবে।

ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিলে শরীরের ক্ষতি হয় কি ?

আগেই বলেছি আমাদের দেহে রক্তের প্রধান ভূমিকা কি ? রক্ত তার হিমগ্লোবিনের সাহায্যে বাতাসের অক্সিজেন গ্রহণ করতে পারে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস চলে। দেহে রক্ত কমে গেলে অ্যানিমিয়া এবং অন্যান্য রোগ হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস ঠিকমত হয় না। অনেক সময় বেশী রক্তক্ষরণের জন্য রক্ত-কমে যাওয়ায় অনেক রোগী বাঁচে না। তখন তাদের রক্ত দেওয়া দরকার। অথচ ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত না থাকায় অনেকে বাঁচে না রক্তের অভাবে। আমরা প্রায় প্রতি মানুষই মাঝে মধ্যে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দিতে পারি। রক্ত দিলে কয়েকদিনের মধ্যে নতুন রক্ত তৈরী

হয়ে সে জায়গা পূরণ করে। দেহের কোন ক্ষতিই হয় না। এটা অনেকে জেনেও কেন যে ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত দেয় না সেটাই আশ্চর্যের ব্যাপার।

মারা যাবার সময় চোখ, কিড্‌নি দান করা উচিত কেন?

দেহে রক্তের মতনই প্রয়োজনীয় চোখ, কিড্‌নি ইত্যাদি। এগুলো কেউ মারা যাবার পরও কিছুক্ষণ ঠিক থাকে। কারও হৃদ্‌পিণ্ড বন্ধ হয়ে গেলেই বলি লোকটির মৃত্যু হয়েছে। এসময় চোখের পাতা খোলা থাকলে খোলাই থাকবে, বন্ধ থাকলে বন্ধই থাকবে। দেহ ক্রমশঃ ভারী হয়ে যাবে, দেহেরই ভেতরের বাতাস বেরিয়ে যাবার জন্য। দেহের ভিতরে বাতাস থাকায় বাইরের বাতাসের চাপ আমাদের সইতে হয় না। মারা গেলে দেহের ভিতরের এই বাতাস বেরিয়ে যাওয়ায় দেহ ভারী হয়ে যায়। হৃদ্‌স্পন্দন, হাতের নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া যায় না। তবে মানুষটি মারা যাবার পরও কিছুক্ষণ ধরে তার চোখ, কিড্‌নি ঠিক থাকে। সেই অবস্থায় তার চোখ বা কিড্‌নি তুলে অন্য কারো দেহে (যার সেটা নেই) স্থাপিত করলে পরের মানুষটি অনেকটা কার্যক্ষম হয়ে উঠতে পারে। কাজে কাজেই আমাদের চোখ, কিড্‌নি মারা যাবার পর যাতে কাজে লাগে সেজন্য দান করে গেলে ক্ষতিটা কি!

দাঁত, চোখ সম্বন্ধে কেন জানতে হয়?

দাঁত—কি করে দাঁতের যত্ন নিতে হয়, তা আজ সবার জানা। সকালে ঘুম থেকে উঠে টুথপেষ্ট, নিমডাল দিয়ে দাঁত মাজলে এবং রাতে শোবার আগে দাঁত মাজলে দাঁত এবং শরীরের পক্ষে ভাল তা আজ সবার জানা। চুলের যত্ন কিভাবে নিতে হয় তা ছেলেদের চাইতে মেয়েরা আরও ভালো করে জানে। তেল, ঘি কম খাওয়াই ভাল। আজেবাজে তেল না মেখে নারকেল তেল বা অন্য কোন ভাল তেল মাখতে হয়। কি মাখলে চুলের বাড় ভালো হয়, চুল

চকচকে হয় তা আজ বিজ্ঞাপনের প্রভাবে অনেকেরই জানা। তবে চুল ঠিক রাখতে গেলে পেটের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

চোখ—চোখের যত্ন কিভাবে নিতে হয় তাও সবার জানা। বারবার চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া যে ভাল, চোখ বেশী ঘসা যে ভাল নয় তা আজ অনেকেরই জানা। যারা বেশী সবুজ রঙ দেখে থাকেন তাদের চোখ ভাল থাকে। অকৃত্রিম সূর্যালোক বিশেষ করে সূর্যের সকালের রোদ যারা চোখে লাগান তাদের চোখ ভাল থাকে।

কতটা ঘুমোলে সবচাইতে ভাল ?

ঘুম নিয়ে অনেকে সমস্যায় পড়েন। কতটা ঘুমানো উচিত ? কম ঘুমানো শরীরের পক্ষে কি খারাপ ? বেশী ঘুমানো শরীরের পক্ষে ভাল কি ? ঘুম প্রতিটি মানুষের, প্রতিটি প্রাণীর দরকার। প্রতিটি প্রাণীর মানুষের দেহ এক একটি যন্ত্রবিশেষ। প্রতিটি যন্ত্রের যেমন বিশ্রাম দরকার, প্রতিটি প্রাণীর, প্রতিটি মানুষেরও তেমনি বিশ্রামের প্রয়োজন। ঘুমের মধ্যে দিয়ে বিশ্রাম সবচাইতে ভাল হয়। এমনি চুপচাপ কোন কাজ না করে বসে থাকলেও বিশ্রাম হয়। তবে সেটা দেহের বিশ্রাম। মনের বিশ্রাম অতটা হয় না। কেননা মানুষ কখনো কোন জিনিস চিন্তা না করে থাকতে পারে না। কোন না কোন জিনিস চিন্তা হয়ই। ফলে মন খুব বেশী বিশ্রাম পায় না। মন সবচাইতে ভাল বিশ্রাম পায় ঘুমের মধ্য দিয়ে।

যে মানুষটি যত বেশী দৈহিক বা মানসিক পরিশ্রম করে তার ঘুমও ততটা বেশী হওয়া উচিত। আবার এই দৈহিক পরিশ্রম এবং মানসিক শ্রমের মধ্যেও একটা সাম্য থাকা ভাল। সাধারণতঃ একটি পূর্ণবয়স্ক মানুষের সাত / আট ঘণ্টা ঘুম দরকার। এটাই সাধারণতঃ চালু আছে। তবে আমার মনে হয় দৈহিক ও মানসিক শ্রমের ১ ঘণ্টা মানসিক শ্রম = ৮ ঘণ্টা দৈহিক শ্রম। শ্রমের সঙ্গে ঘুমের পরিমাণের আরও সঠিক সম্পর্ক বের করতে হবে। এই সম্পর্ক থেকে প্রতিটি

মানুষ ঠিক করে নিতে পারবে তার কত ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। দিনে পারিপার্শ্বিক গণ্ডগোল বেশী থাকায় একই পরিমাণ বিশ্রামের জন্য রাত্তিরের তুলনায় দিনে সাধারণতঃ বেশী ঘুমোতে হয়। তবে ঘুমের পরিমাণটা অভ্যেসের উপরও অনেকটা নির্ভরশীল। করো কারো নয়/দশ ঘণ্টা ঘুমালেও ঠিক বিশ্রাম হয় না। আবার কারো কারো চার/পাঁচ ঘণ্টা ঘুমালেই বিশ্রাম হয়ে যায়। বেশী ঘুমানো এমনিতেও ভাল না। এতে আলসেমি অনেক বেড়ে যায়। তাই গাণিতিক হিসেবে কতটা পরিমাণ ঘুমালে মানুষটির পরিশ্রমের সঠিক বিশ্রাম হয়, ঠিক সেই পরিমাণ ঘুমানো অভ্যেস করতে হয়। আর সেটাই হবে সব চাইতে স্বাস্থ্যকর ব্যাপার।

শেষ রাতের স্বপ্ন সত্যিই কি মিলে যায়?

ঘুমাবার সময় অনেকে স্বপ্ন দেখলে বিশ্রামটা অনেক কমে যায়। বিশেষ করে দুঃস্বপ্ন দেখলে তো ঘুমের পরেও মনে হয় ঘুমটা যেন ঠিক হল না। আমরা যে সমস্ত কাজকর্ম করি, চিন্তা-ভাবনা করি, বিশেষ করে অবচেতন মনের চিন্তা-ভাবনাগুলিই স্বপ্নে প্রকাশ পায়। তাই স্বপ্নের বিষয়-বস্তুগুলির সঙ্গে বাস্তবের যোগ পুরোপুরি নষ্ট হয় না। তাই স্বপ্নে দেখা কোন ব্যাপার ভবিষ্যতে মিলে গেলেও যেতে পারে। আবার মেলে না এমন ব্যাপারও ঘটে। আর পঞ্চ-ইন্দ্রিয়ের বাইরের জ্ঞানকে স্বীকৃতি দিলে বলা যায় যেহেতু মন রেডিওর মতো একটা যন্ত্র, সেজন্য ভবিষ্যতের কোন তরঙ্গ যার সঙ্গে পুরানো বা বর্তমান তরঙ্গের সম্পর্ক আছে তা আগেভাগে মনের কেন্দ্রে ধরা পড়তে পারে। অর্থাৎ ভবিষ্যতে কোন ঘটনা আগেভাগে মনে আঁচ করা যেতে পারে স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। তবে এই স্বপ্ন শেষ রাতের বা প্রথম রাতের বলে পৃথকীকরণ ঠিক নয়। সব সময়ের স্বপ্ন স্বপ্নই।

কর্কশ আওয়াজ ক্ষতিকর কেন?

সবশেষে আর একটি প্রচলিত ধারণা নিয়ে আলোচনা করা যাক। অনেকের ধারণা বেশী আওয়াজের মধ্যে থাকা ঠিক নয়। এটা হৃদ্‌যন্ত্রের

পক্ষে খারাপ। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানী, বেশীর ভাগ বলছি কেন, সব বিজ্ঞানীই বলেন,—হ্যাঁ, এই ধারণাই ঠিক। বেশী কর্কশ আওয়াজ, জোর আওয়াজের মধ্যে থাকলে সেই আওয়াজ বুকে ধাক্কা মারে। হৃদপিণ্ডের কাজকে ব্যাহত করে। আর বেশীদিন ব্যাপারটা ঘটলে হৃদযন্ত্র খারাপ হয়ে পড়ার সমূহ সম্ভাবনা। শব্দ-তরঙ্গের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়ার উপর যথেষ্ট প্রভাব আছে। শব্দ-তরঙ্গের মনের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব আছে। কর্কশ আওয়াজে বেশীক্ষণ থাকলে মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, মিঠে আওয়াজে মেজাজ ঠাণ্ডা হয়।

জ্বর কোন রোগ নয় কেন?

কাউকে কাউকে বলতে শোনা যায় জ্বর কোন রোগই নয়। কথাটা কি ঠিক? হ্যাঁ, ডাক্তারদের তাই মত। তাঁরা বলেন—জ্বর আসলে অন্য কোন রোগের উপসর্গ। আমাদের শরীরে সব সময় কিছু তাপ তৈরী হচ্ছে আর কিছু তাপ ক্ষয় হচ্ছে। এই তৈরী তাপ এবং ক্ষয় পাওয়া তাপের মধ্যে সুস্থ সময়ে একটা সাম্য থাকে। কিন্তু মানুষের শরীরে অন্য রোগ হলে এই তৈরী তাপ আর ক্ষয় পাওয়া তাপের মধ্যে সাম্য নষ্ট হতে পারে। সাম্য নষ্ট হয়ে যদি তৈরী তাপের পরিমাণ ক্ষয় পাওয়া তাপের চাইতে বেশী হয় তবে সেই বাড়তি তাপ শরীরে প্রকাশ পায় যেটাকে আমরা জ্বর বলি। আসলে সেই রোগ যার জ্বর একটা উপসর্গ নির্মূল করলেই জ্বর কমে যায়। অবশ্য সেই রোগকে না সারিয়েও জ্বর কমানো যায়। তার জন্য নানা পথ আছে। 'ক্যালপল' ট্যাবলেট খেলে, 'ক্রোসিন' সিরাপ খেলে ইত্যাদি পদ্ধতিতে গায়ের তাপ কমানো যায়। জ্বর বেশী হলে মাথা ধুইয়ে কপালে জলপটি দিয়ে আস্তে আস্তে মাথায় হাতপাখার হাওয়া করলেও তাপমাত্রা নেমে আসে। হোমিওপ্যাথিতেও তাপমাত্রা কমাবার ও জ্বর কমাবার ওষুধ রয়েছে। কিন্তু একটা কথা আবার বলছি, জ্বর আসলে কোন রোগ নয়, অন্য রোগের উপসর্গ মাত্র। কারুর তাই জ্বর হলে দেখতে হবে জ্বর কি রোগের জন্য

হয়েছে? চিকিৎসা সেই রোগেরই করা উচিত। সেই রোগ কমে গেলেই জ্বর কমে যাবে। জ্বর হ'লেই 'ক্যালপল' ইত্যাদি ট্যাবলেট না খাওয়াই ভাল। জ্বর তাহলে সাময়িক কালের জন্য কমলেও আবার হবার সম্ভাবনা থাকে। হোমিওপ্যাথিতে অবশ্য জ্বরকে একটা উপসর্গ ই ধরা হয়।

পায়খানা করার সময় কাহিল হয়ে পড়লে কি করতে হয়?

বেশীবার পায়খানায় গিয়ে অনেকে কাহিল হয়ে পড়েন। ঘন ঘন শ্বাস পড়তে থাকে, বেশ শ্বাসকষ্ট হয়। তখন করণীয় কি? ডাক্তার তো ডাকতেই হবে। তবে তার আগে প্রাথমিক চিকিৎসা সবাই করতে পারে। আধ কাপ গরম জল একটু ঠাণ্ডা করে তাতে এক চামচ চিনি ও একটু নুন দিয়ে গুলে নিতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে কিছু সময় অন্তর অন্তর এক চামচ/দুই চামচ করে জল রোগীর মুখে ঢেলে দিতে হবে। এভাবে আর একটু বেশী তৈরী করে অনেকক্ষণ ধরেও রোগীর সেবা করা যায়। এর ফলে স্যালাইনের কাজ হবে। রোগীর শ্বাসকষ্ট অনেক কম হবে। তবে বেশী শ্বাসকষ্ট হলে ডাক্তারের শরণাপন্ন হয়ে স্যালাইন দেবার ব্যবস্থা করাই ভাল।

শ্বাসকষ্টের রোগীদের কি করা উচিত?

শ্বাসকষ্টের রুগীদের কি করা উচিত? ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে দেখা উচিৎ তার শ্বাসকষ্ট কিসের জন্য হচ্ছে—পলিপাসের জন্য না সাইনাসের জন্য, না অন্য কোন কারণে। অনেক সময় পেটের গ্যাস উপরে উঠে শ্বাসকষ্ট দেয়। আসল কারণটা খুঁজে চিকিৎসা করা উচিত। তবে ডাক্তাররা বলেন—শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখার জন্য আরও কিছু করণীয় আছে। রোজ সকালে মুখ ধোওয়ার সময় ইষদুষ্ণ জল নাকের ফুটো দিয়ে টানতে হবে এবং মুখ দিয়ে সেই জল বের করতে হবে। মুখ দিয়ে না-বার

করতে পারলে নাক দিয়েই বার করতে হবে। এভাবে বেশ কয়েক বার করতে হবে। রাত্রিরে শোওয়ার আগে ইষতুষ্ণ জলে স্নান করে সেই জল নাক দিয়ে টেনে মুখ দিয়ে বার করতে হবে। এরকম বেশ কয়েকবার করতে হবে। এভাবে রোজ করলে নাকের ফুটো এবং শ্বাসনালীর অনেকটা পরিষ্কার থাকে। ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসও বেশ স্বাভাবিকভাবেই হবে।

চোখ এবং গ্যাসের রুগীদের করণীয় কি?

চোখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দেওয়া খুবই ভালো। তবে একটা বিশেষ পদ্ধতিতে করলে চোখ ও অন্যান্য স্নায়ু আরও ভাল থাকে। মুখে ঠাণ্ডা জল নিয়ে মুখভর্তি করে, মুখবন্ধ করে ফুলিয়ে রাখতে হবে। এই সঙ্গে চোখে এবং ঘাড়ে বারবার ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা দিতে হবে। তারপর মুখের জল ফেলে আবার নতুন জল মুখে নিয়ে আবার এরকম করতে হবে। এভাবে বারবার করলে চোখের স্নায়ু এবং পারিপার্শ্বিক স্নায়ু সতেজ থাকে। অন্য জায়গার দুর্বল স্নায়ুকে সবল করবার নানারকম ব্যাপার আছে। নানারকম মানসিক প্রক্রিয়া আছে। এগুলি ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ মতেই হওয়া উচিত। একগাদা ডাইজিন ইত্যাদি ট্যাবলেট না খাওয়াই ভাল। বেশী খেলে এগুলোতে পরে ভাল কাজ হয় না। তবে গ্যাসের রুগীদের একটা কথা সবসময় মনে রাখতে হবে, পেট কখনো খালি রাখা উচিত নয়। আর সবরকম খাদ্য, শাক ইত্যাদি যা খেলে গ্যাস হতে পারে সেসব খাদ্য না খাওয়াই ভাল। অনেক গ্যাসের রোগীকে বারবার শুক্‌নো মুড়ি খেতে দেখা যায়। এটা মন্দ নয়। আর মুড়িতেতো কোন কষ্টই হয় না।

বড়দিন কি সত্যিই বড় দিন?

বড়দিন কি সত্যিই বড় দিন? ছোটদের সঙ্গে সঙ্গে বড়দের মনেও অনেক সময় প্রশ্নটা উকি মারে। এর উত্তর—না, বড়দিন

বড়দিন তো নয়ই, বরং বছরের সব চাইতে ছোট দিনের প্রায় সমান বলা যায়। সূর্যের চারদিকে পৃথিবী ঘুরছে। আমরা দেখি উল্টোটা। অর্থাৎ পৃথিবীর চারদিকে সূর্য ঘুরছে। সূর্যের অবস্থানের উপর দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য নির্ভর করে। ২১শে মার্চ দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য সমান। তারপর ক্রমশঃ দিনের দৈর্ঘ্য বাড়ে আর রাতের দৈর্ঘ্য কমে। দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের মধ্যে অন্তরফল ক্রমশঃ বাড়ে। এই অন্তরফল সবচাইতে বেশী হয় ২১শে জুন। সেদিন দিন সবচাইতে বড়, আর রাত সবচাইতে ছোট। তারপর থেকে ২২শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উল্টো ব্যাপারটা ঘটতে থাকে। অর্থাৎ দিন ক্রমশঃ ছোট হয়ে আসে, আর রাতের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়ে। কিন্তু তখনো দিনের দৈর্ঘ্য রাতের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশী থাকে, শুধু তাদের দৈর্ঘ্যের অন্তরফল কমতে থাকে। এই অন্তরফল কমতে কমতে একেবারে কমে যায় ২৩শে সেপ্টেম্বর। অর্থাৎ ২৩শে সেপ্টেম্বর দিনরাত্রির দৈর্ঘ্য সমান। তখনো কিন্তু দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ ছোট হচ্ছে, আর রাতের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়ছে অর্থাৎ রাতের দৈর্ঘ্য এবং দিনের দৈর্ঘ্যের অন্তর ক্রমশঃ বাড়ছে। এই অন্তর সবচাইতে বেশী হচ্ছে ২২শে ডিসেম্বর। ২২শে ডিসেম্বর রাতের দৈর্ঘ্য বছরের মধ্যে সবচাইতে বেশী। আর দিনের দৈর্ঘ্য সব চাইতে কম। তারপর থেকে ২১শে জুন পর্যন্ত চলে উল্টো ব্যাপারটা, অর্থাৎ এই সময় দিনের দৈর্ঘ্য ক্রমশঃ বাড়ে আর রাতের দৈর্ঘ্য দিনের দৈর্ঘ্যের তুলনায় বেশী থাকে। শুধু রাতের দৈর্ঘ্যের আর দিনের দৈর্ঘ্যের অন্তর কমতে থাকে। কমতে কমতে একেবারে কমে যায় ২১শে মার্চ। অর্থাৎ ২১শে মার্চ দিন-রাতের দৈর্ঘ্য সমান। একথা আগেই বলেছি। অর্থাৎ বছরে দুইদিন ২১শে মার্চ আর ২৩শে সেপ্টেম্বর দিন-রাতের দৈর্ঘ্য সমান। বছরের সবচাইতে বড়দিন আর ছোট রাত হচ্ছে ২১শে জুন। বছরের সবচাইতে ছোট দিন আর বড় রাত হচ্ছে ২২শে ডিসেম্বর। বড়দিন ২৫শে ডিসেম্বর অর্থাৎ সবচাইতে ছোট দিনের খুব কাছে, তাই মোটেই বড়দিন নয়। বরং

বলা যেতে পারে বড়দিন বছরের সবচাইতে ছোট দিনের প্রায় সমান। এটাও অবশ্য অনেকে জানে যে ২৫শে ডিসেম্বর বড়দিন, যীশুখ্রীষ্টের জন্মদিন এই হিসেবে।

সারাদিন গোধূলি থাকে কোথায় ?

গ্রহ নক্ষত্রের আলোচনাই যখন চলে এল তখন এরই উপরে আরও দুই একটা কথা আলোচনা করা যাক। সূর্য পূর্বদিকে উঠে। গ্রীষ্মকালে উত্তর দিক থেকে পূর্বদিক এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি। শীতকালে সূর্যকে দক্ষিণ থেকে পূর্ব এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি। বছরের প্রতি দিনই সূর্যকে পূর্বে উঠে পশ্চিম দিগন্তে অস্ত যেতে দেখি। এই সময়টুকু দিন অর্থাৎ সূর্যের আলো পাবার কথা। সূর্য পশ্চিম দিগন্তের নীচে চলে যাবার পর সূর্যের আলো পাবার কথা নয়। তবু পশ্চিম দিগন্তের নীচে চলে যাবার পরেও কিছুক্ষণ সূর্যের আলো পেয়ে থাকি আমরা। একে বলে গোধূলি। ঠিক একই ব্যাপার ঘটে সূর্য পূর্ব দিগন্তে উঠবার ঠিক আগের মুহূর্তে। আসলে সূর্যের আলো বায়ুমণ্ডলের মধ্য দিয়ে আসার সময় প্রতি-সরণের জন্য কিছুটা বেঁকে এসে চোখে পড়ে। এরই ফলে দিগন্তের নীচে চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ (দিগন্তের নীচে ১৮° পর্যন্ত) সূর্যের আলো পেয়ে থাকি। তবে কতক্ষণ এই গোধূলি থাকবে তা পৃথিবীর কোন জায়গা থেকে দেখছি তার উপরেও নির্ভর করবে। তাহলে প্রশ্ন উঠছে, পৃথিবীর এমন কোন জায়গা আছে কি যেখান থেকে সারারাত ধরে গোধূলি দেখা যাবে, অর্থাৎ সারারাত রাতের অন্ধকার থাকবে না ; থাকবে গোধূলির আলো ! হিসেব করে দেখা গিয়েছে পৃথিবীর যে সমস্ত জায়গা একটা নির্দিষ্ট নিয়ম মানে সে সমস্ত জায়গা থেকে সারারাত ধরে গোধূলি দেখা যাবে অর্থাৎ সে সমস্ত জায়গায় সারারাত রাতের অন্ধকার থাকবে না, থাকবে গোধূলির আলো।

গ্রহ-তারাগুলোকে যেখানে দেখি সেগুলো কি তাদের প্রকৃত অবস্থান?

প্রতিসরণের কথাই যখন উঠলো—তখন বলে রাখি আমরা আকাশের যে জায়গায় তারা, গ্রহ দেখি, সেগুলো তাদের প্রকৃত অবস্থান নয়। শুধু প্রতিসরণের জন্যই নয়, পৃথিবীর গতির ফলে এবং আরো কিছু কারণে গ্রহ, তারাগুলোকে আমরা আকাশের প্রকৃত স্থানে দেখতে পাই না। তবে এই বিচ্যুতি খুবই সামান্য। এই বিচ্যুতি কত তা হিসেব করে বেরও করা যায়। আর এই বিচ্যুতি বের করে গ্রহ এবং তারাগুলোর প্রকৃত অবস্থানও বের করা যায়।

গ্রহগুলোর দূরত্ব ও গতিতে কোন নিয়ম আছে কি ?

এই গ্রহগুলো, নক্ষত্রগুলোও সমানে ঘুরে চলেছে। কেউই স্থির নয়। সবারই এক একটা সাম্রাজ্য রয়েছে। সেই সাম্রাজ্যের বাইরে কেউ যায় না। তাই তাদের মধ্যে ধাক্কাও লাগে না। শুধু তাই নয়, গ্রহগুলোর দূরত্বের মধ্যেও একটা নিয়ম আছে। তাদের গতিসংক্রান্ত বিভিন্ন (তিনটি প্রধান নিয়ম) নিয়ম আছে। এগুলো কেপ্‌লারের নজরে এসেছিল। এর ফলে তাদের সাম্রাজ্য, গতি, অবস্থান, নিয়ন্ত্রিত থাকে ; ফলে তাদের মধ্যে ধাক্কাও লাগে না।

সময়ের নিয়ম কি?

আমাদের গ্রহ-জগতের সম্রাট সূর্য। আগে সূর্যের অবস্থান দেখে, ছায়া দেখে সময় নির্ধারিত হত। এই সূর্যের সময় আর ঘড়ির সময় কিন্তু সমান নয়। তবে কখনো কখনো সমানও হয়। সময় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন। এটার কারণ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে সূর্যকে বিভিন্নভাবে দেখা যায়। তাই এক জায়গায় দিন হলে অন্য জায়গায় রাত হতে পারে। এক জায়গায় সকাল দশটা হলে আর এক জায়গায় বিকাল চারটা হতে পারে। সময়ের নিয়ম থেকে বিভিন্ন জায়গার সময় বের করা যায়।

বাড়ি তৈরীর সময় কোন্ কোন্ দিকে নজর দেওয়া উচিত ?

বাড়ি তৈরীর সময় অনেকে নিজেই ডিজাইন করে থাকেন। ফলে মাথা গুঁজবার আস্তানা ঠিকই তৈরী হয়, কিন্তু বেশির ভাগই সুদৃশ্য হয় না। আর খরচও অনেক বেশী হয়।

এখন অবশ্য অনেকেই ভাল ডিজাইনের দিকে ঝুঁকেছেন। খরচও যাতে কম হয় সেদিকেও নজর আছে কারো কারো।

অনেকের ধারণা বাড়ি দক্ষিণ-মুখো অর্থাৎ বাড়ির সামনের দিক দক্ষিণে না থাকলে ভাল হাওয়া বাতাস খেলে না বাড়িতে। কিন্তু ধারণা পুরোপুরি সত্যি নয়। আমাদের হাওয়া বাতাস বেশী দরকার গরমকালে। সূর্যকে পূর্বদিক থেকে পশ্চিমদিকে আসতে দেখি আমরা। শীতকালে দক্ষিণায়ন অর্থাৎ তখন সূর্যকে দক্ষিণ দিক থেকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখি। গ্রীষ্মকালে হয় ঠিক উল্টো ব্যাপারটা। তখন উত্তরায়ণ। অর্থাৎ সূর্যকে তখন উত্তর দিক থেকে পূর্ব দিকে এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে আসতে দেখি। কাজেই উত্তর দিকের বাতাস গরম হয়ে হালকা হয়ে উপরে উঠে। আর সেই ফাঁকা জায়গা পূরণ করতে বাতাস ধেয়ে আসে দক্ষিণ দিক থেকে। এই বাতাসকেই আমরা দক্ষিণী বাতাস বলি। এই বাতাসেরও সময়ে সময়ে কিছুটা পরিবর্তন হয়। যখন বঙ্গোপসাগর ইত্যাদির উপর দিয়ে আসে তখন জলীয় বাষ্প নিয়ে আসার বৃদ্ধি হতে পারে। দিক অনুসারে, সময় অনুসারে আসার পথে সাগর, পর্বত পড়লো কিনা সেই অনুসারে বিভিন্ন বাতাসের বিভিন্ন নাম দেওয়া হয়েছে। বাড়ির দরজা জানলা যদি দক্ষিণ মুখে থাকে, বিশেষ করে শোবার ঘরের জানালা যদি দক্ষিণমুখো থাকে তবে সেখানে দক্ষিণী বাতাস গরমকালে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কেউ কেউ বলতে পারে শীতকালে তো তাহলে বাতাস পাওয়া যাবে না। শীতকালে ঠাণ্ডা থাকে বলে শীতকালে বাতাসের প্রয়োজন হয় না। তাই দরজা জানলা, বিশেষ করে শোবার ঘরের জানালা দক্ষিণমুখো করতে হয়।

বাড়িকে ঠাণ্ডা রাখার উপায় কি?

বাড়ির দক্ষিণদিকে পুকুর থাকলে ভাল। বাড়ির উত্তরদিকে বড় গাছ থাকলে বাড়ির দক্ষিণ দিক ছায়ায় থাকবে। সূর্য গরমকালে উত্তর দিকে থাকলেও গাছের ছায়ার জন্য বাড়ি বেশী উত্তপ্ত হতে পারবে না। তাছাড়া পুকুর দক্ষিণ দিকে থাকায় বাতাস দক্ষিণ দিক থেকে আসার সময় অনেকটা ঠাণ্ডা হয়ে বাড়িতে প্রবেশ করে। গরমকালে বাড়ির দক্ষিণদিকের দরজা জানালা জলে ভিজানো থাকা উচিত। সব সময় জলে ভিজিয়ে রাখার জন্য দক্ষিণের দেওয়ালের মধ্য দিয়ে জলের পাইপের ব্যবস্থা থাকা উচিত। পাইপের মুখ থাকবে এর ঠিক গায়ে। ফলে সব সময় ভিজানোর ব্যবস্থা থাকবে। শুধু তাই নয়। দেওয়ালের মধ্যে জলের পাইপ থাকায় এবং তাতে জলের প্রবাহ থাকায় দেওয়াল ঠাণ্ডা থাকে এবং স্বভাবতই দক্ষিণের বাতাস আরও বেশী ঠাণ্ডা হয়ে এসে ঘরে ঢোকে।

এয়ার-কুলারের পদ্ধতি অবলম্বন করে ঘরকে আরও বেশী ঠাণ্ডা রাখা যায়। তাছাড়া সস্তায় এয়ার কুলারও বসানো যায়। দশ ফিট লম্বা, দশ ফিট চওড়া কোন ঘরে এয়ার-কুলার বসাতেই আড়াই হাজার টাকা থেকে তিন হাজারের বেশী খরচ হয় না। পার্টস্ কিনে নিজে এয়ার কুলার যন্ত্র বানিয়ে নিলে খরচ আরও অনেক কম পড়বে।

বাড়ির বাগান কোন দিকে করা উচিত?

বাড়ির বাগান কোন দিকে করলে গাছপালা ভাল বাড়বে? গাছ-পালার বৃদ্ধির জন্য সূর্যের আলো একান্ত দরকার। পর্যাপ্ত সূর্যরশ্মি বিশেষ করে সকালের সূর্যের আলো দরকার। গরম কালে সূর্য উত্তর দিক থেকে যায় পূর্ব থেকে পশ্চিমে। শীতকালে কিন্তু দক্ষিণ দিক থেকে সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখা যায়। তাই শীতকালে যে সমস্ত ফল-ফুল হয় সেই গাছপালা দক্ষিণ দিকের বাগানেই লাগানো ভাল। গ্রীষ্মকালে যে সমস্ত ফুল, ফল হয় সেই সমস্ত গাছ-পালা উত্তরদিকের বাগানেই লাগানো ভাল। এই ব্যবস্থার ফলে

ঐ ঐ সময়ের গাছ ভাল সূর্যের আলো পায়। আর যেগুলো বছরের সব সময়ই হয় সেগুলো পূর্বদিকেই লাগানো ভাল। কারণ পূর্বদিকের বাগানের গাছপালা বছরের সব সময়েই সকালে সূর্যের আলো পাবে। আর সকালের সূর্যের আলোটাই বেশী উপকারী।

বাড়ির পূর্বদিকে দুই-একটা জানালা থাকা ভাল। কারণ ঐ একই। সকালের সূর্যের রোদ মানুষের শরীরের পক্ষেও খুব ভাল। সকালের সূর্যের রোদ গায়ে মাখতে পারলে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়, আয়ু দীর্ঘ হয়। চোখের শক্তিও বাড়ে। অনেক চর্মরোগের হাত থেকে বাঁচা যায়।

মাছের ব্যবসা সবচাইতে লাভজনক কি করলে হয়?

অনেকের মাছের ব্যবসা আছে। তারা যদি ভেবে থাকেন মাছ ছাড়ব আর এক বছর পরে তা বিক্রি করব, তাহলে তারা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হবেন না। হলেও এর চাইতে বেশী লাভের উপায় বলে দিতে পারি। মাছ বিজ্ঞানসম্মত ভাবে চাষ তো করতেই হবে, সঙ্গে সঙ্গে মাছ কতটা পরিমাণ তুলব তার কথাও ভাবতে হবে। গণিতে এর উপরে আমার মডেল আছে। অবশ্য এক ধরনের মাছের বৃদ্ধি যেহেতু এক একরকম সেজন্য বিভিন্ন মাছের মডেলও বিভিন্ন। এই মডেল দেখে বলে দেওয়া যায়, কোন্ মাছ কোন্ সময়ে কতটা পরিমাণ তুললে সর্বাধিক লাভ হয়।

কোন কারখানায় সর্বাধিক লাভ কি ভাবে সম্ভব?

এবার কারখানার লাভের কথা ধরা যাক। কারখানায় লাভ যে ভেরিয়েবেলের উপর নির্ভরশীল তা ভেবে দেখতে হবে। তারপর ভেরিয়েবেলগুলির মধ্যে যে বাধ্যবাধকতা আছে তা নিয়ে সমীকরণ-গুলো তৈরী করতে হবে। এই বাধাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে লাভের ফাংশনের মান, সবচাইতে কত বেশী হয় তা বের করতে হবে। এবং সর্বাধিক মান ভেরিয়েবেলগুলির কোন কোন মানে হয় তা জানতে

হবে। নির্ভরশীল কারণগুলির মান ঐ ঐ মানে রাখলে সর্বাধিক লাভ অবশ্যম্ভাবী।

সবচাইতে নিখুঁতভাবে রোগনির্ণয় ও সারানো কিভাবে সম্ভব ?

ডাক্তারীকে এখনো অনেকে বলে থাকেন পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান। এ যেন অনেকটা আন্দাজে রোগ নির্ণয়ের এবং তার প্রতিকারের চেষ্টা। আজকাল গণিত রোগ নির্ণয়ে এবং তার প্রতিকারে এগিয়ে এসেছে। অনেকগুলি রোগের অনেকটা এক ধরণের কয়েকটা লক্ষণ থাকতে পারে। ঐ সম্ভাব্য রোগগুলির মধ্যে কোন রোগের সম্ভাবনা সবচাইতে বেশী তা গণিতের সাহায্যে নিখুঁত ভাবে বার করা যায়। ডাক্তার মানুষ, তাই তার ভুলও হতে পারে। সম্ভাব্য রোগগুলির কোন একটি হয়ত তার মনে পড়ল না। অথচ এটি হয়ত আসল রোগ। কম্‌পিউটারের সাহায্যে আজকাল রোগ নির্ণয় করা যায়। রোগের লক্ষণগুলি কমপিউটারে দিলে কমপিউটার নিখুঁতভাবে বলে দেবে সম্ভাব্য রোগগুলি কি কি। আর মানুষের মতো তার কিন্তু ভুল হবে না। রোগ সারানোর ক্ষেত্রেও গণিতের ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। কোন রোগীর শরীরের বৈশিষ্ট্যগুলির (রক্তের চাপ ইত্যাদি) মান দিয়ে রোগীটির শরীরের রেখাচিত্র আঁকা যায়। আবার কাগজের জায়গাকে কতগুলো রোগের অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। রোগীর শরীরের রেখাচিত্র যে রোগের অঞ্চলে থাকবে বুঝতে হবে রুগীটির সেই রোগ হয়েছে। তারপর ওষুধ প্রয়োগ ঠিক হচ্ছে কিনা তাও বোঝা যায়। ওষুধ খেয়ে রোগীর শরীরের রেখাচিত্র যদি রোগের অঞ্চল থেকে ক্রমশঃ সরে যায় তবে বুঝতে হবে ওষুধ ঠিক দেওয়া হচ্ছে। কতটা পরিমাণ ওষুধ দিতে হবে, কতক্ষণ অন্তর দিতে হবে তাও গণিতের সাহায্যে নিখুঁতভাবে বলা যায়। একসঙ্গে বেশী ওষুধ দিলে অনেকে ভাবে ওষুধ খাওয়ার অন্তরটা বেশী হবে। কিন্তু ঠিক কত সময় অন্তর ওষুধ খাওয়ালে সবচাইতে বেশী ভাল ফল

পাওয়া যাবে তা তারা জানেন না। এটা একমাত্র গণিতের সাহায্যেই বের করা যায়। প্রত্যেকটি রোগীর খাদ্য নির্দিষ্ট এবং তার পরিমাণও নির্দিষ্ট। হাসপাতালে নানা ধরণের রোগী থাকে। কোন খাদ্য আসলে সব রোগী তার চাহিদা অনুযায়ী খাবার পাবে এবং খরচও সবচাইতে কম হবে তাও গণিতের সাহায্যে বের করা যায়।

এলোপ্যাথিক সব ওষুধই কি কড়া ?

অনেকের ধারণা এলোপ্যাথি রোগটাকে চেপে দেয়। হোমিওপ্যাথি রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করে। এরকম ধারণাও ঠিক নয়। এলোপ্যাথিও রোগকে গোড়া থেকে নির্মূল করতে পারে। অনেকের ধারণা এলোপ্যাথিতে রোগ হোমিওপ্যাথির থেকে অনেক অল্প সময়ে সারানো যায়। অনেকের ধারণা এলোপ্যাথিতে কড়া ওষুধ, হোমিওপ্যাথিতে তা নয়। এটাও পুরোপুরি সত্য নয়। এলোপ্যাথিতে কড়া ওষুধ নয় এমন ওষুধও আছে। আবার হোমিওপ্যাথিতে অপেক্ষাকৃত কড়া ওষুধ কিছু আছে। তবে তুলনামূলক ভাবে বলা যায় হোমিওপ্যাথির তুলনায় এলোপ্যাথির কড়া ওষুধের পরিমাণ বেশী।

মানুষ কি অন্য কোন গ্রহের প্রাণীর বংশধর ?

বিজ্ঞানের আলোয় কয়েকটি ধারণা যাচাই করা যাক। আমাদের অনেকের ধারণা মানুষের পূর্বপুরুষ বানর। কিন্তু এই ধারণা কি সত্যি ? বিজ্ঞানীরা একমত হয়ে বলেন—না। ডারউইনের বিবর্তনবাদ অনুযায়ী বলা যায় এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণী তৈরী হয়েছে এবং যোগ্যতা অনুযায়ী টিঁকে আছে। বিবর্তিত প্রাণীর মধ্যে হঠাৎ কোন বৈশিষ্ট্য আসতে পারে না। মানুষ ছাড়া অন্যান্য প্রাণীদের মধ্যে এমন কি বানরের মধ্যেও সৃজনীক্ষমতা ইত্যাদি মস্তিষ্কের উৎকৃষ্ট গুণগুলি নেই যা আছে মানুষের মস্তিষ্কে। বিজ্ঞানীদের মতে তাই বলা যায় বানর ও মানুষের মধ্যে একটা মিসিং-লিঙ্ক

আছে। সেই মিসিং লিঙ্কের প্রাণী কি পৃথিবীরই? যদি পৃথিবীর হয়, তবে তার আগের পর্য্যায় বানর, গরিলা। কিন্তু তাদের মস্তিষ্কে তো সৃজনীক্ষমতা নেই। তবে অনেকের ধারণা, এই সময় অন্য কোন গ্রহ, অন্য কোন নক্ষত্রলোক থেকে উন্নততর প্রাণী এসেছিল পৃথিবীতে। আর তার বংশধর হচ্ছে মানুষ। যেটাই সত্যি হোক, একথা অন্ততঃ জোর দিয়ে বলা যায় মানুষের পূর্বপুরুষ বানর নয়।

জগদীশচন্দ্র গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছিলেন—এটা কি ঠিক ধারণা?

এ ধারণাও ঠিক নয়। গাছের প্রাণ আছে তা-অনেকদিন আগেই জেনেছিলেন আমাদের মুনি ঋষিরা। জগদীশচন্দ্র কিছু যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন—হ্যাঁ, সত্যি সত্যিই গাছের প্রাণ আছে। গাছ প্রাণীদের মতো কিছু কিছু ব্যাপারে সাড়া দেয়।

ঘোড়া কি এক ধরণের কুকুর থেকে হয়েছে?

বিজ্ঞানীদের উত্তর—হ্যাঁ। প্রয়োজনে এক ধরণের কুকুরের নখ আস্তে আস্তে বেড়ে শক্ত হয়ে হয়েছে খুর। আকারে হয়েছে বড়। এমনি করে এক বিশেষ ধরণের কুকুর থেকে ঘোড়ার জন্ম।

জিরাফ কি ঘোড়া থেকে হয়েছে?

এরও উত্তর—হ্যাঁ। ডারউইনের তত্ত্ব অনুযায়ী প্রয়োজন অনুসারে প্রাণীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পাল্টিয়েছে। এক ধরণের এক অঞ্চলের ঘোড়ার উঁচু উঁচু গাছের পাতা খেতে খেতে তাদের গলায় টান ধরেছে। এমনি করে আস্তে আস্তে বহু পুরুষ ধরে তাদের গলা ক্রমশঃ বেড়েছে। তৈরী হয়েছে ঘোড়া থেকে জিরাফ। তবে প্রশ্ন হচ্ছে—এখন কেন এরকম হয় না? আসলে এখন এই প্রয়োজনগুলো ফুরিয়েছে। ফলে এই ধরণের পরিবর্তন আর হচ্ছে না। কুকুর থেকে ঘোড়াও হচ্ছে না, আবার ঘোড়া থেকে জিরাফও হচ্ছে না।

কয়েক হাজার বছর পর মানুষের চেহারা কেমন হবে ?

মানুষের শরীরেও যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোন প্রয়োজন নেই তা আস্তে আস্তে বিলুপ্ত হবে। বেশ কয়েক হাজার বছর পরেও যদি সভ্যতা টিঁকে থাকে তখন হয়তো মানুষের ভুরুর চুল যাবে উঠে। মাথাটা হবে বড়। নাকের, কানের ফুটোগুলোই হয়তো থাকবে শুধু। তাছাড়া মানুষ কৃত্রিমভাবেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে। কাজেই তখনকার মানুষকে হয়তো মানুষ হিসেবে চেনাই কষ্টকর হবে।

ঈগল মারলে ক্ষতি হয় কেন ?

ঈগল মেরে ফেলা উচিত নয়। প্রত্যেকটি প্রাণী কোন না কোন শৃঙ্খলে আবদ্ধ। মেরে ফেলবার আগে সেই শৃঙ্খলের দিকে তাকাতে হবে। আর না হলে সমূহ ক্ষতি হবার আশঙ্কা। ঈগল পাখী খায় সাপ। সাপ খায় ব্যাঙ। ব্যাঙ খায় পঙ্গপাল। ঈগল মারলে সাপ বাড়বে। সাপ বাড়লে ব্যাঙের সংখ্যা কমবে। ব্যাঙের সংখ্যা কমলে পঙ্গপালের সংখ্যা বাড়বে অর্থাৎ শস্যের ক্ষতি, এভাবে শৃঙ্খলের কথা না ভেবে কোন প্রাণীকে মারা ঠিক নয়। তাতে মানুষের সমূহ ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে।

জ্বালানীর জ্বালা কমানো যায় কিভাবে ?

জ্বালানি-সমস্যা আজ ঘরে ঘরে, দেশে দেশে, সমস্ত পৃথিবী জুড়ে। পৃথিবীর জ্বালানি ক্রমশঃ ফুরিয়ে আসায় সূর্যের দিকে নজর গিয়েছে। সূর্যের শক্তি ফুরোতে হাজার বছর লেগে যাবে। তাই একে প্রায় অফুরন্ত বলা যেতে পারে।

সূর্যের শক্তিকে ব্যবহার করার বিভিন্ন পদ্ধতির কথা ভাবা হচ্ছে। কিন্তু সেরকম অল্প খরচের কোন ব্যবস্থা আজও চালু হয়নি। আমি অবশ্য এখন এরকম একটা পদ্ধতির কথা বলব। এ পদ্ধতি, লেখকেরই আবিষ্কার। এই পদ্ধতি ঘরে ঘরে চালু হলে জ্বালানি সমস্যা অনেকটা মিটে যাবে, এই পদ্ধতিতে খরচও অনেক কম।

ঘরের রান্নাঘরের ছাদে একটা বড় গোলাকার ফাঁক করতে হবে, অথবা এরকম কৃত্রিম রান্নাঘর তৈরী করা যায় ভেতরে ফাঁকঅলা ত্রিপল খাটিয়ে। এবার ঐ গোলাকার ফাঁকে একটা অয়েল পেপার লাগাতে হবে। তারপর আস্তে আস্তে জল ঢালতে হবে যতক্ষণ-না জলের তল উপরের তলের সমান হয়। ব্যাস্, এর ফলেই ওয়াটার লেন্স তৈরী হবে। সূর্যের আলো এই লেন্সে পড়ে সমস্ত রশ্মি মেঝের কিছু উপরে কোন বিন্দুতে একত্রিত হয়। এই বিন্দুর তাপমাত্রা খুব বেশী। এই বিন্দুতে রান্না করার জিনিস রাখলে অল্প সময়ে রান্না হয়ে যাবে। এই বিন্দুর অবস্থানও হিসেব করে বের করা যায়। অথবা উপরেও ফাঁকের ক্ষেত্রফল কমিয়ে বাড়িয়ে এই বিন্দুকে ইচ্ছে মতো জায়গায় আনা যায়। সেই বিন্দুতে কোন টুল বা টেবিলের সাহায্যে রান্না করার পাত্র রাখতে হবে। তবে এখানে তাপ পাত্রের নীচের থেকে আসে না। আসে উপর থেকে। রশ্মিগুলি যেভাবে আসছে সেই অনুসারে পাত্র বসাতে হবে যাতে পাত্রের সব জায়গা তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হতে পারে। হিসেব করে দেখেছি লেন্সের উপরের তল গোলাকার হলে সবচাইতে বেশী রশ্মি ধরা যাবে। উপরের তল যত বড় হবে তত সেই বিন্দু বেশী উত্তপ্ত হবে। তবে সেই বিন্দু যাতে ঘরের সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে সেদিকেও নজর দিতে হবে। অবশ্য এই পদ্ধতিতে রান্না শুধু দিনের বেলাতে যখন সূর্য থাকবে তখন সম্ভব। এই পদ্ধতিতে জল গরম করে জলীয় বাষ্প তৈরী করে সেটার সাহায্যে টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে সঞ্চয় করে রাখা যায়। যখন সূর্য থাকবে না আকাশে বা রাত্তিরে এই বিদ্যুৎ ব্যবহার করা যেতে পারে। অবশ্য এই টারবাইনের ব্যবহার একার পক্ষে সম্ভব নয়। অনেকে মিলে, পাড়ার সবাই মিলে এই ব্যবস্থা নিতে পারে। তবে সেই পাড়া জ্বালানির দিক থেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারে। প্রতি পাড়ায় এই স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যবস্থা গড়ে উঠলে এবং তাদের মধ্যে সহযোগিতা থাকলে আর চিন্তাটা কোথায়?

কি করলে মোটরগাড়ীর তেল খরচ কম হয় ?

মোটরগাড়ীর জ্বালানি সমস্যাও অনেককে ভাবিয়ে তুলেছে। তেলের বদলি কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা তাই চলেছে। একজন তো জলের সাহায্যে মোটরগাড়ি চালাবার চেষ্টা করছেন। তবে মোদ্দা কথা, এখন পর্যন্ত তেলের বদলি কিছু বেরোয়নি। চিন্তাটা তাই কি করলে তেলের খরচ কম হবে ? গাড়ীর গতি যত বেশী হবে তত খরচ কম হবে। অর্থাৎ কোন জায়গা থেকে কোন জায়গায় যেতে গেলে যত স্পীডে গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যাবে ততই তেল খরচ কম।

অনেক সময় দেখা যায় ট্র্যাফিক জ্যামে গাড়ী দাঁড়িয়ে পড়লো। ইঞ্জিন চালু আছে। তখন কি মিটার উঠবে ? হ্যাঁ উঠবে। ইঞ্জিন চালু থাকলেই মিটার উঠবে। তবে কম উঠবে। তাই গাড়ী না থামলে কোথাও, যত স্পীডে যাওয়া যাবে তেল খরচ তত কম হবে। আর ট্রাফিক জ্যাম দীর্ঘায়িত হলে গাড়ীর ইঞ্জিন বন্ধ করে দেওয়াই ভাল। তেল খরচ বাঁচাবার জন্য এখন অনেকে তাই চিন্তা করছেন কোন গাড়ী কিনলে তেল খরচ কম হবে অর্থাৎ অল্প তেলে বেশী পথ যাওয়া যাবে। তবে মুশকিল এই, যে গাড়ীতে অল্প তেল লাগে সে গাড়ীর দাম হয়তো বেশী।

জন্ম নির্ণয়ে, জন্ম হারে ও আয়ুর উপরে আলোর প্রভাব কি ?

প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে জন্ম নির্ণয়ে আলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। প্রমাণিত হয়েছে নীলাভ আলোতে বেশীর ভাগ মেয়ে জন্মায়, গোলাপী বর্ণের আলোতে সাধারণতঃ ছেলেই বেশী জন্মায়।

দীর্ঘ আয়ুর উপরও আলোর যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। পরীক্ষাগারে দেখা গিয়েছে ঠাণ্ডা ফ্লুওরেসেণ্ট আলোতে যে ইঁদুরগুলো জন্মায়, তারা অন্যান্য ইঁদুরের চাইতে অধিক বাঁচে। এটা হতে পারে যে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের মানুষেরা বেশী বাঁচে পর্যাপ্ত প্রকৃতির আলোকের জন্য।

বৈজ্ঞানিকদের ধারণা যদি কেউ কোনরকমে একটুও অকৃত্রিম আলোক থেকে বঞ্চিত হয়, তবে সেটা তার আয়ু কমার পক্ষে পর্যাপ্ত কারণ হতে পারে।

আলোর রঙ, তাপমাত্রা ও মেজাজের সম্পর্ক কি ?

বেশীদিন আগের ঘটনা নয়। ফ্লোরিডা রেডিও স্টেশনের কণ্ট্রোল-রুম। পরিবেশকে আরও চাকচিক্যময় করে তুলবার জন্য ঘরে পাটলবর্ণের ফ্লুওরেসেণ্ট আলো ব্যবহার করা হয়। দু'দিনের মধ্যে দেখা গেল ঘোষকরা অত্যন্ত রূঢ় মেজাজের হয়ে উঠেছে এবং প্রত্যেকেই কর্তৃপক্ষের উপর অকারণে চটে যাচ্ছে।

দুজন কর্মী হঠাৎ কাজ ছেড়ে দিল। শেষকালে একজন বলল, ঘরের ঐ রংয়ের বাতি সরিয়ে না ফেললে সে যা-তা কাজ করে ফেলবে। অতঃপর আবার সাদা রংএর বাতি জ্বালানো হলো এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এল। এমনিভাবে বোঝা যায় আলোর রঙ ও মেজাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এজন্য এক একপ্রকার ঋতুতে মেজাজ এক একরকম হয়।

এমনিভাবে তাপমাত্রার সঙ্গেও মেজাজের সম্পর্ক রয়েছে। এক একরকম তাপমাত্রায় এক একরকম মেজাজ হয়।

মনে ঋতু পরিবর্তনের প্রভাব কি ?

শব্দ, আলো, রঙ, তাপমাত্রা এবং অন্যান্য কারণগুলোর দেহে ও মনে যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে। দেহের বৃদ্ধি এদের পরিবর্তনে যেমন কমবেশী হয় তেমনি এদের পরিবর্তনে মনেরও যথেষ্ট পরিবর্তন হয়।

এক এক ঋতুতে আবহাওয়াও এক একরকম হয়। শীতে ঠাণ্ডা যেমন থাকে তেমনি থাকে উজ্জ্বল সূর্যালোক; বর্ষায় আলো প্রায়ই থাকে না, তাপমাত্রাও কখনো কম কখনো বেশী, তাছাড়া বৃষ্টি পড়ার রিমঝিম শব্দ, গরমকালে আবার তাপমাত্রা খুব বেশী হয়। বসন্ত

কালে গাছ-গাছড়া, ফুলে ফলে প্রকৃতির রঙ যায় পাল্টিয়ে। ফলে মনেরও পরিবর্তন হয়। এক এক ঋতুতে এক একরকম তার মেজাজ।

গরমকালে ক্লান্ত ভাবটা থাকে, শীতে মনে সজীবতা অনেক বেশী হয়। বর্ষায় কুঁড়েমি জাঁকিয়ে বসে মনে। আর বসন্তে মনটা খুশীতে ভরে যায়, রোমাঞ্চিত হয়। অবশ্য বেশী হারের জন্মের জন্য বসন্তের চাইতে গ্রীষ্মই উপযুক্ত সময়। গ্রীষ্মে মাথার পিনিয়াল গ্ল্যাণ্ড উত্তেজিত হয়, বা যৌন গ্ল্যাণ্ডকে প্রভাবিত করে। এর ফলেই গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে জন্মহার বেশী। প্রকৃতির সঙ্গে এমনি নিবিড় যোগ প্রাণের। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে দেহ, মনের, প্রাণের পরিবর্তন হয়ে চলেছে অনবরত।

স্বাদ নিয়ন্ত্রণে শব্দের ভূমিকা কি?

যে কোন পানীয় যে কোন খাবারের স্বাদের সঙ্গে শব্দের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে।

ধরা যাক কেউ চা খাচ্ছে। তার সামনে এক ধরণের শব্দের সৃষ্টি করা হচ্ছে। এবারে যদি শব্দের কম্পন আস্তে আস্তে পাল্টান হয়, তবে চায়ের স্বাদও আস্তে আস্তে পাল্টিয়ে যাবে। শব্দের বিভিন্ন কম্পাঙ্কে চায়ের স্বাদও বিভিন্ন মনে হবে। প্রত্যেক পানীয়ের উপর শব্দের এমনিই প্রভাব রয়েছে।

এখন ঠিক করা হচ্ছে কোন খাবার, কোন পানীয় শব্দের কোন কোন কম্পাঙ্কে সবচাইতে বেশী স্বাদযুক্ত মনে হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে কোন লোকের কাছে কোন পানীয় শব্দের যে কম্পাঙ্কে সবচাইতে বেশী স্বাদযুক্ত মনে হয় অন্যান্য অধিকাংশ লোকের কাছেও সেই পানীয় শব্দের সেই কম্পাঙ্কেই সবচাইতে বেশী স্বাদযুক্ত মনে হবে।

খারাপ থেকে ভাল হওয়া সম্ভব!

ছোট হ'লে কি হবে, ক্ষমতা এদের অসাধারণ। বিভিন্ন জিন

শরীরের বিভিন্ন আকৃতি-প্রকৃতির জন্য দায়ী। কোন জিন লম্বা হওয়ার জন্য দায়ী, কোন জিন ফর্সা বা কালো হওয়ার জন্য দায়ী, কেউবা মোটা হওয়ার জন্য দায়ী। এত যাদের ক্ষমতা তাদের সম্পর্কে কৌতূহল জাগা খুবই স্বাভাবিক। প্রত্যেকটা জিনই কতকগুলো নিউক্লিক অ্যাসিডের সমষ্টিমাত্র। জিনের বিভিন্ন গঠনের জন্য আমরা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য লাভ করি। খারাপ আকৃতি-প্রকৃতির জন্য দায়ী জিনগুলোকে কি করে ভাল আকৃতি-প্রকৃতির জন্য দায়ী জিনে পরিবর্তিত করা যায়—বৈজ্ঞানিকরা তার চেষ্টা করছেন।

জিনগুলো এত ছোট ছোট আর এত ঘন ঘন আছে যে একটা জিনের গঠন পরিবর্তিত করতে গেলে অন্য জিনের ক্ষতি হবার সমূহ সম্ভাবনা থাকে। তবুও চেষ্টা চলছে। নানারকম রশ্মি (আল্‌ফা, বিটারে ইত্যাদি) ও নানা রকম রাসায়নিক পদার্থ কাজে লাগান হচ্ছে। উৎকৃষ্ট আম, উৎকৃষ্ট ধান, উৎকৃষ্ট ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। ভবিষ্যতে হয়তো ল্যাবরেটরিতেই পচ্ছন্দসই বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট মানুষ তৈরি করা যাবে। তবে এর অশুভ সম্ভাবনাও রয়েছে। যাদের এই ক্ষমতা থাকবে তারা হয়তো একটা জাতকে শেষ করে দিতে পারে। এমনকি জড়বুদ্ধিও পর্যন্ত করে দিতে পারে।

নিদ্রাকে জয় সম্ভব?

এখন অনিদ্রা রোগীদের ভয় কিছুটা কেটে গিয়েছে। সম্প্রতি এমন এক ধরণের বিছানা তৈরী হয়েছে, যাতে শুলে অতি অল্প সময়েই আরামে ঘুমিয়ে পড়া যায়। এটা নিয়ে আমেরিকার ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ক্যারোলিনাতে পরীক্ষা চলছে। আগে ঘুমাবার যে ওষুধ ছিল বেশ কয়েকদিন যাবার পর দেখা গিয়েছে তার কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু এই বিছানায় শুয়ে ঘুমালে ক্ষতির সম্ভাবনা তো থাকেই না, বরং বেশ কয়েক রাত এই বিছানায় শুলে অনিদ্রারোগ পুরোপুরি সেরে যায়।

এই বিছানা বালুকণার মত ছোট ছোট কাচের দানা দিয়ে তৈরী।

একজন রোগী এক নাগারে কুড়ি বছর ঘুমোতে পারেন নি, অথচ এই বিছানায় শোবার অল্প কিছুক্ষণ পরেই তিনি সুন্দর আরামদায়ক ঘুমে ঘুমিয়ে পড়েন।

রোগ জয়ের নতুন সম্ভাবনা কি?

বৈজ্ঞানিকরা বলেছেন কোন খনিজ গুঁড়ো (যাদের আকার সুষম নয়) যদি শরীরে থাকে তবে তাদের পাশের যে টিস্যু তা বাড়িতে থাকে। তার কারণ শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত চাপ বা রক্তের চাপ অথবা মানুষের নড়াচড়ার ফলে যে চাপ শরীর-মধ্যস্থিত বিষম আকারের খনিজ গুঁড়োর উপর পরে তার ফলে খনিজ গুঁড়ো তড়িৎ ত্যাগ করে। এই তড়িৎই গুঁড়োর চারপাশ্ব স্থিত টিস্যুকে বাড়তে বাধ্য করে।

বৈজ্ঞানিকরা মনে করেন যক্ষ্মা রোগ, অকাল বার্ধক্য, সন্ধিবাত ইত্যাদি রোগও এধরণের তড়িৎ-ঘটিত রোগ। এই বিষয়ে জোর গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানের এক দিগন্ত খুলে যাচ্ছে।

রক্ত-ঘটিত রোগ কিরূপ?

এক একটা অস্বাভাবিক হিমোগ্লোবিনের জন্য এক একটা রোগের সৃষ্টি হয়। এ রোগগুলো বংশগত রোগ। আর বংশগত রোগ কখনো সারানো যায় না। হিমো-এক এর জন্য যে রোগ হয় তার নাম থালাসিমিয়া রোগ। এ রোগের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যারা ভোগে তাদের অনেকটা একই রকম দেখতে হবে, মনে হয় যেন তারা একই পরিবারের। এ রোগ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই দেখা যায়, তবে ভারতবর্ষেই এ রুগীদের সংখ্যা বেশী।

হাতের লেখা দেখে মানুষ সনাক্তকরণ সম্ভব?

প্রত্যেক মানুষের হাতের লেখা বিভিন্ন। এক একটা অক্ষরের বিভিন্ন বক্রতার জায়গাগুলো পরীক্ষা করে ও কয়েকটা বিশেষ অক্ষর পরীক্ষা করে দুটো বিভিন্ন হাতের লেখা সহজেই চেনা যায়। পোষ্ট-

অফিসের কর্মীদের হাতের লেখা মিলিয়ে এভাবে একজন অপরাধী ধরা পড়েছিল। পুরণো ঠিকানা মুছে নতুন ঠিকানায় মনিঅর্ডার লিখে সে এভাবে কিছু টাকা আত্মসাৎ করেছিল।

হাত বা পায়ের ছাপ দেখে অপরাধী নির্ণয় সম্ভব ?

যদি হাত বা পায়ের ছাপ থেকে অপরাধী চেনা যায়, তবে সহজেই অপরাধীকেও নির্ণয় করা যায়। প্রতিটি মানুষের হাতের ছাপ বিভিন্ন। পৃথিবীতে এমন জুটি পাওয়া যাবেনা, যাদের হাতের ছাপ হুবহু এক। তাই হাতের ছাপ পরীক্ষা অপরাধী নির্ণয়ের অন্যতম প্রধান অস্ত্র।

অপরাধীর মনের ছবি কেমন ?

সমস্ত চিন্তাভাবনা মাথাতে বিদ্যুৎতরঙ্গের আকারে খেলে। এক একধরণের চিন্তা-ভাবনার জন্য এক একধরণের বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলে। আজকাল একধরণের যন্ত্র বেরিয়েছে যার সামনে কোন মানুষ দাঁড়ালে তার মাথায় কি ধরণের বিদ্যুৎতরঙ্গ খেলছে তা যন্ত্রে ধরা পড়ে। এভাবে কোন অপরাধীর মনে কি ধরণের চিন্তা ভাবনা হচ্ছে তা বলে দেওয়া যায় এবং অপরাধীর অপরাধ সনাক্ত করা যায়।

অক্ষিপট সংযোজন সম্ভব ?

লেসার হচ্ছে একধরণের রশ্মি। এর রশ্মিগুলোকে লেন্সের সাহায্যে একটা বিন্দুতে একত্রিত করলে সেই বিন্দুর তাপমাত্রা শতকোটি সূর্যের তাপমাত্রার সমান হবে। এই প্রচণ্ড তাপ ব্যবহার করে কলকারখানার বিভিন্ন পদ্ধতি সহজে সম্পন্ন হয়।

নতুন মণি চোখে বসিয়ে মণির চারপাশে লেসার রশ্মি ফেলে মণিটাকে নার্ভের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়। মাত্র কুড়ি মিনিটেই অপারেশন শেষ। ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন, হাইড্রোজেন ও পারমাণবিক বোমার দুর্বল সংযোগস্থল এর সাহায্যে নষ্ট করে দেওয়া যায়।

বিভিন্ন প্রাণীর আয়ু কিরকম ?

আয়ুর বৈচিত্র্য সত্যিই লক্ষণীয়। এক একধরণের প্রাণীর গড় আয়ু এক একরকমের। এই গড় আয়ু প্রাণীটির দেহের আয়তনের উপর মোটেই নির্ভর করেনা। তবে আমার মনে হয় দেহের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের উপর গড় আয়ু নির্ভর করে। অবশ্য এ নিয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন।

এবার কয়েকটি প্রাণীর গড় আয়ু বলছি। পিঁপড়েরা ১৫ বছর বাঁচে। ঈগল পাখী ৮০ বছরের বেশী বাঁচে। অনেক তোতাপাখী ১০০ বছরের বেশী বাঁচে। দাঁড়কাক ৫০ বছরের বেশী বাঁচে। কাকাতুয়া ৯০ বছর বয়স লাভ করে থাকে। পাতিহাঁসের পরমায়ু ১২ বছর ধরা হয়। সাধারণতঃ পোষা পাখীরা স্বাধীন পাখীদের চেয়ে বেশীদিন বেঁচে থাকে।

মাছেদের মধ্যে পাতামাছ বাঁচে ২৫ বছর, গোল্ড ফিস বাঁচে ৩০ বছর, ক্যাটফিস বাঁচে ৬০ বছর। রুই, কাতলা মাছও বেশী দিন বাঁচে।

বিড়াল বাঁচে ১৫ বছর, কুকুর ৩০ বছর, ছাগল ১৫ বছর, ভেড়া ১১ বছর, খরগোস ৫ বছর বাঁচে। ঘোড়া ৫০ বছর, উট ৪০ বছর, শূকর ১৫ বছর, খেঁকশিয়াল ২০ বছর, সিংহ ৪০ বছর বাঁচে। হাতী ৫০ থেকে ১০০ বছর বাঁচতে পারে। কচ্ছপ ৩০০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে।

অ্যামিবারা কি অমর ?

একটি মাত্র কোষ নিয়ে অ্যামিবার দেহ। বংশবৃদ্ধির সময়ে অ্যামিবাটি গোলাকৃতি ধারণ করে। এর মধ্যে নিউক্লিয়াস ক্রমশঃ লম্বা হতে থাকে, পরে নিউক্লিয়াসের মাঝখানটা আর সাথে সাথে দেহের মাঝখানটাও সরু হয়ে পরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং একটা অ্যামিবা দুটো অ্যামিবাতে পরিণত হয়। এদের বলা হয় অ্যামিবা দুহিতা। এক মায়েরই দুই মেয়ে যেন। কিন্তু মায়ের আর আলাদা

কোন অস্তিত্ব থাকে না। কাজেই অ্যামিবা মারা যাবার আগেই দুটো অ্যামিবার মাঝে নতুন করে জীবন শুরু করে। এই অর্থেই এদের অমর বলা যায়।

হাইড্রা প্রাণী অমরত্বের অধিকারী ?

অ্যামিবার মতো আরেকটি প্রাণী হলো হাইড্রা। এরা জলজ প্রাণী। এদের দেহ সরু লম্বা নলের মতো, এরা জলের মধ্যে কোন কঠিন বস্তুর সাথে নলাকৃতি দেহের তলদেশর সাহায্যে আটকে থাকে। এদের বংশবৃদ্ধির প্রকৃতি হলো অ্যামিবার মতোই। লম্বালম্বি ভাবে ভেঙে গিয়ে একটি হাইড্রা থেকে দুটি হাইড্রা দুহিতা তৈরী হয়। যদিও এই দুভাগে সব অঙ্গ থাকে না, কিন্তু সেগুলো তৈরী করে নিতে পারে এরা। গ্রীসীয় পুরাণে রয়েছে হাইড্রা ছিল এক অতিশয় জীব। যার ৯টি মাথা ছিল। একটা কেটে ফেললে সেখানে দুটো মাথা গজাতো। হাইড্রার কোন অংশ কাটা গেলে তা আবার গজিয়ে ওঠে। তাই এদের অমরই বলা যায়।

'বার্ধক্যের আঘাতে মৃত্যু হয় না'—ঠিক কি ?

বিজ্ঞানীরা অনেক খোঁজ খবর নিয়েও এমন একটি মানুষের সন্ধান পাননি যে মারা গেছে বার্ধক্যের আঘাতে। দেহ জরাজীর্ণ হয়ে মৃত্যু হয়েছে এই স্বাভাবিক মৃত্যুর সন্ধান তারা একটিও পাননি। তারা দেখেছেন যে মানুষের মৃত্যু ঘটে ব্যাধিতে বা দুর্ঘটনায়। কাজেই আমরা আশা করব যে রোগ নিরাময়ের দিকে যতই এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে, মানুষের পরমায়ুও ততই বেড়ে যাবে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি আজ দ্রুত এগিয়ে চলেছে। রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-করে মানুষ একশ বছর বেঁচে থাকে এমন ওষুধ বেরিয়েছে। শক্তি সামর্থ নিয়েই মানুষ শতায়ু হবে। এটাও অনেকে বলেছেন।

বংশানুক্রমের জন্য ও মানুষের মাঝে সারা দেহে জরা আসতে পারে কোন একটি বিশেষ কারণের জন্য। আবার সারাদেহে জরা

না এসে একটি অঙ্গ বার্দ্ধক্যের দ্বারা আক্রান্ত হয় —এটাই সাধারণতঃ দেখা যায়। দেহকোষের মধ্যেই এই ব্যাপারটি জড়িত।

'মানুষও একদিক থেকে অমর'—ঠিক কি ?

মরণের আগে মানুষ রেখে যায় বংশধরদের। বংশধররা আবার রেখে যায় তাদের বংশধরদের। এমনিভাবে বংশ পরম্পরায় মানুষ অমর হয়েই বেঁচে থাকে।

উচ্চ শ্রেণীর সব প্রাণীই যৌনপদ্ধতিতে বংশবিস্তার করে। কোষ-বিভাজনের ফলে এর বৃদ্ধি ঘটে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন হয়।

কোষ বিভাগের আদি পর্যায়েই সৃষ্টি হয় যৌন-কোষের। এরাই হলো জীবসৃষ্টির সব রহস্যের মূলীভূত কারণ। এদের মাঝেই রয়েছে বংশগতির বিধান। দেহ-কোষগুলো মৃত্যুর অধীন কিন্তু যৌন কোষগুলো অনন্ত জীবনের অধিকারী। এই অমর যৌন কোষ একদেহ থেকে সন্তান-সন্ততির দেহে তা থেকে তার সন্তান-সন্ততির দেহে এমনিভাবে বংশপরম্পরায় দেহ থেকে দেহান্তরে বেঁচে থাকে। এদিক থেকে অবশ্য প্রাণের সৃষ্টির সেই আদি থেকে প্রাণ-প্রবাহ বয়ে চলেছে সবার মধ্যে।

জোনাকীর আলো কি ?

জীবন্ত জোনাকীর লেজে লুসিফেরিণ, লুসিফেরিজ, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ইত্যাদির রাসায়নিক যৌগের আধিক্যের জন্যই আলো বেড়োয়। আবার বিভিন্ন রাসায়ণিক পদার্থের মাঝে মিশ্রণ ঘটানোর জন্য জোনাকীর স্নায়ুতন্ত্র দায়ী। এদের ইচ্ছেমত রাসায়নিক সংযোগ ঘটিয়ে জোনাকী আলো বের করে। সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলেই আলো বের হয় না। এই ব্যাপারটি অতি দ্রুত ঘটে থাকে বলে জোনাকীর আলো জ্বলে আর নেভে।

ঝিঁ ঝিঁ পোকার সঙ্গীত-প্রিয়তা কেমন ?

ঝিঁ ঝিঁ পোকার বিচিত্র সঙ্গীত-প্রিয়তার কথা অনেকেরই জানা

আছে। বিশেষ করে গ্রামের দিকে এদের বাস। গান বন্ধ হলেই ঝিঁ ঝিঁ পোকারাও নিজেরাও গানের আসর বসায়। এদের ঐক্যতান শুরু হবার পর ধীরে ধীরে চড়া হয়ে উঠে, আবার আস্তে আস্তে থেমে যায়। যারা এই ঐক্যতানে সুর না মেলাতে পারে তারা দলেতে যোগ দেয়না। ঝিঁ ঝিঁ পোকাদের এই সঙ্গীতের উৎস হলো দুটি পর্দা। এই পর্দা দুটোকে যখন এরা কাঁপায় তখন শব্দ তৈরী হয়, আর গর্তে থাকার জন্য পর্দা মারফৎ এই শব্দ বহুগুণ বেড়ে গিয়ে জোরালো শব্দের সৃষ্টি করে।

'ময়ূরের বিপদ সঙ্কেত' বলতে কি বোঝায়?

'ময়ূর নাচে পেখম তুলে'—ছোটবেলায় আমরা সবাই পড়েছি। রামধনুর মত রঙের বাহার নিয়ে পুচ্ছ যে পাখীর—তা হলো ময়ূর—ভারতের জাতীয় পাখী। শ্রীকৃষ্ণের চুড়ায় এই ময়ূরের পালকই শোভা পেতো। সম্রাট সাজাহানের ময়ূর সিংহাসনের কথা আমরা জানি। এই ময়ূরের শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তি দুইই প্রখর। বিপদ সংকেত জানানোর জন্য এরা একধরণের শব্দ করে। সাপের পরম শত্রু এই ময়ূর। এরা সামাজিক প্রাণী, দলবেঁধে বাস করে। ময়ূরের এত বাহার, কিন্তু এর গলার আওয়াজ কর্কশ।

ঘুমের সময় কতটা হওয়া উচিত?

ঘুমের সময় এক একধরনের। ফুল, উদ্ভিদের এক একরকম। মানুষ যেমন সাধারণতঃ রাতে ঘুমায়, অধিকাংশ বন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীর ঘুমাবার সময় কিন্তু দিনের বেলাই।

ফুলেদের কেউ কেউ ঘুমায় দিনে। যেমন সন্ধ্যামনি, শালুক দিনের বেলায় ঘুমায়। সন্ধ্যাবেলা ফোটে। বাবলা গাছ রাত্রিতে ঘুমায়। ঘুমের পরিমাণও এক একজনের এক একরকম। কেউ অল্প ঘুমায়, কেউ বেশী ঘুমায়। কেন এই বিভিন্নতা তার কারণ সঠিকভাবে জানার জন্য গবেষণার প্রয়োজন।

জন্মাবার পরই হাঁটে কারা ?

ভারতীয় বাইসন জন্মাবার কিছু পরেই হাঁটতে পারে। ঘণ্টা খানেক পরে ছুটতে পারে। এক একরকম প্রাণীর হাঁটতে পারার সময় এক একরকম। কারো কারো হাঁটতে দু / তিন বছর পর্যন্ত লেগে যায়। হাঁটতে পারার সময় প্রাণীর দেহের আকৃতি ও বংশগত ধারার উপর নির্ভর করে।

কোন প্রাণী একসঙ্গে ক'টা বাচ্চা দেয় ?

এক একরকমের প্রাণী একসঙ্গে একরকমের বাচ্চা দেয়। কেউ একসঙ্গে একটার বেশী বাচ্চা দেয়না। যেমন মানুষের সাধারণতঃ একসঙ্গে একটার বেশী হয়না। কুকুরের একসঙ্গে একাধিক বাচ্চা হয়। বিড়ালের একসঙ্গে অনেক বাচ্চা হয়। মাছ একসঙ্গে হাজার হাজার ডিম পাড়তে পারে, এই বাচ্চা দেওয়ার সংখ্যা প্রাণীটির দেহের গঠন-শৈলীর উপর নির্ভর করে।

টুরিস্ট পাখী কারা ?

হ্যাঁ পাখীদের মধ্যেও টুরিস্ট পাখী আছে। বিশেষ করে শীতকালে তো কিছু কিছু পাখীর রীতিমত বেড়াবার ইচ্ছে। আলিপুর চিড়িয়াখানাতেই দেখা যায়, বহু দূর দূর থেকে সেখানে শীতকালে বহু পাখী এসে বাসা বাঁধে। এবার সত্যি কথাটা ফাঁস করি। পাখীদের একজায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থান-বদলের মূল কারণ কিন্তু খাবারের অভাব।

কিছু কিছু প্রাণী ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেয় কি ?

ভূমিকম্পের পূর্বাভাস ভূগর্ভস্থ পাথরখণ্ডের তড়িৎ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়া থেকে বোঝা যায়। এই পূর্বাভাসের নানাদিক থেকে চেষ্টা চলেছে।

তবে বর্তমানে কিছু কিছু প্রাণীর আচরণের অস্বাভাবিকতা দেখেও ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেবার চেষ্টা চলেছে।

চীনে এই নিয়ে গবেষণাও হচ্ছে। চিংড়ি মাছের আচরণ ভূমিকম্প হবার কিছু আগে অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ব্যাঙের আচরণেরও পরিবর্তন হয়। কিছু কিছু পাখীর ব্যবহারের অস্বাভাবিকতা দেখা যায়। তবে আমার মনে হয় সবচাইতে অস্বাভাবিকতা দেখা দেবে গর্তের মধ্যে বিশেষ করে গভীর গর্তে যারা থাকে—তাদের আচরণের মধ্যে। ভূমিকম্প হবার অনেক আগেই তাদের আচরণের পরিবর্তন লক্ষ্য করা উচিত।

কোন জাতের বয়স কিভাবে বের করা যায়?

আগেই বলা হয়েছে বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য একটি নির্দ্দিষ্ট ধারা মেনে চলে। কত পুরুষ পরে কাদের সংখ্যা কত হবে তা লেখকের মডেল থেকে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়।

লেখকের আর একটি মডেল থেকে কোন জাতের এভাবে বয়সও বের করা যায়। কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্যের সংখ্যা n পুরুষ পরে কত হবে তা লেখকের মডেল থেকে পাওয়া যায়। জাতের বর্তমান বয়স n হলে, বর্তমানে ঐ বৈশিষ্ট্যটির সংখ্যা গুণে বের করে ঐ সমীকরণে বসালেই n এর মান অর্থাৎ জাতটির বয়স অর্থাৎ কত পুরুষ আগে জাতটি তৈরী হয়েছে তা নির্ভুলভাবে বের করা যায়।

কোন জাত কিভাবে শ্রেষ্ঠ হতে পারে?

লেখকের শ্রেষ্ঠ জাত হবারও একটি মডেল আছে। খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলির সংখ্যা কি শর্ত মানলে শূন্য এর দিকে এগোয়, তার দিকে নজর রেখে লেখক নির্বাচনের সময় কতকগুলি শর্ত বের করেছেন সেগুলি মানলে কয়েক পুরুষ পরে খারাপ বৈশিষ্ট্যগুলি সেই জাত থেকে একেবারে বিলুপ্ত হবে।

প্রাণের প্রবাহ, বিবর্তনবাদ ও সুনির্মল রায়ের মডেল কি?

আগেই বলেছি, একটি জাতের বয়স কিভাবে বের করা যায়। এভাবে পৃথিবীর প্রতিটি জাতের বয়স বের করে বলে দেওয়া যায়

কোন কোন জাত একই সময়ে তৈরী হয়েছে, কোন কোন জাতের মিশ্রণ থেকে কোন জাত তৈরী হয়েছে।

এভাবে প্রাণের সৃষ্টি থেকে প্রাণের প্রবাহের একটা সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যাবে; বিবর্তনবাদ লেখকের এই মডেল থেকে নতুন ভাবে বিচার করে দেখা যাবে।

বিভিন্ন আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য কোন পুরুষে কত ?

সন্তান অর্ধেক জিন পায় পিতার কাছ থেকে, অর্ধেক পায় মাতার কাছ থেকে। তাই পিতা-মাতার জিনের উপর সন্তানের জিন নির্ভর করে। আবার স্বামী, স্ত্রী নির্বাচনের সময় কোন জিন যদি খুব বেশী গুরুত্ব পায় তবে সেই জিনের বৈশিষ্ট্যটি কোন পুরুষে কতজন পাবে, কতজন পাবে না তার একটি নির্ভুল আংকিক চেহারা বর্তমান লেখকের মডেল থেকে পাওয়া যায়। xy ক্রোমোসোম থাকলে হয় ছেলে, xx ক্রোমোসোম থাকলে হয় মেয়ে। কেউ কেউ আছেন যারা লালরঙ দেখতে পাননা। এদের বলে রেড কালার ব্লাইণ্ড। এটি x সেক্স ক্রোমোসোমের গায়ের কোন ত্রুটিপূর্ণ জিনের জন্য হয়। এই বৈশিষ্ট্য অনুসারে কোন জাতকে মোট পাঁচভাগে ভাগ করা যায় xy, $\bar{x}y$, xx, $\bar{x}x$, $\bar{x}\bar{x}$, ($\bar{x}$ হচ্ছে ত্রুটিপূর্ণ জিন নিয়ে x ক্রোমোসোম) অর্থাৎ সুস্থ পুরুষ, অসুস্থ পুরুষ, সুস্থ মেয়ে, সুস্থ মেয়ে অথচ রোগটাকে বয়ে চলেছে, অসুস্থ মেয়ে। সুস্থ পুরুষ যদি অসুস্থ মেয়েকে নির্বাচন না করে, আবার সুস্থ মেয়ে যদি অসুস্থ পুরুষকে নির্বাচন না করে, তবে সুনির্মল রায়ের মডেল থেকে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায় কত পুরুষ পরে কাদের সংখ্যা কত হবে। দেখা গিয়েছে সুস্থ মেয়ে অথচ রোগটাকে বয়ে চলেছে এদের সংখ্যা ক্রমশঃ শূন্যতে দাঁড়ায়।

কত পুরুষ পরে কেউ কোন বৈশিষ্ট্য পাবে ?

কোন পরিবারে এক ধরণের বৈশিষ্ট্য দেখা দিল। কত পুরুষ পরে

সেই পরিবার আবার সেই বৈশিষ্ট্যটি পাবে তাও লেখকের আর একটি মডেল থেকে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়। আসলে বৈশিষ্ট্যটির ধারা একটি নির্দিষ্ট অংকের হিসাব মেনে চলে। আর এই হিসাব দেখেই এসব নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়।

দেহের বৃদ্ধির মডেল, বিভিন্ন প্রাণী কেন বিভিন্ন আকার পায়?

বাবা ও মার একটি করে কোষ মিলে সন্তানের একটি কোষ তৈরী হয়। তার ভেতরের রাসায়নিকগুলো ক্রিয়া করতে করতে যে মুহূর্তে একসঙ্গে দ্বিগুণিত হয় সেই মুহূর্তে কোষটি ভেঙ্গে একটি কোষ থেকে দুটি কোষ হয়। পরপর এভাবে দুটি থেকে চারটি, চারটি থেকে আটটি, আটটি থেকে ষোলটি এভাবে অসংখ্য কোষ তৈরী হয়। এদের কেউ তৈরী করে হাত, কেউ পা, এভাবে দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তৈরী হয়। সমস্ত দেহটি তৈরী হবার পরও তার বৃদ্ধি ঘটে। বৃদ্ধি ঘটলেও লেখক অংকের সাহায্যে দেখিয়েছেন প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আপাত বৃদ্ধির হার একটি প্রাণীর ক্ষেত্রে একটি ধ্রুবক, ফলে প্রাণীটির আকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ একারণেই মানুষের বাচ্চা থেকে মানুষ হয়। কুকুরের বাচ্চা থেকে কুকুর হয়। অবশ্য এই ধ্রুবকটি এক একরকম প্রাণীর ক্ষেত্রে এক একরকম। ফলে বিভিন্ন প্রাণীর বিভিন্ন আকৃতি হয়।

দেহের বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব?

লেখকের একটি মডেল থেকে দেহের বৃদ্ধির সামগ্রিক চেহারাটা পাওয়া গিয়েছে। একটি রাসায়নিকের কমবেশী হওয়ার সঙ্গে দেহের বৃদ্ধির কি সম্পর্ক তাও জানা গিয়েছে। রাসায়নিক ক্রিয়াগুলোর গতির সঙ্গে, আলোর রঙ, তাপমাত্রা, দেহের পরিশ্রমের সময়, খাবারের ধরণ ও পরিমাণ, ঘরের আকার, আর্দ্রতা, আবহাওয়া, অভিকর্ষ বল, দিনরাত্রির সময় কৃত্রিমভাবে ইত্যাদির সঙ্গে দেহের বৃদ্ধি কি কি সম্পর্ক তাও জানা গিয়েছে।

এগুলি মাছ ও মুরগীদের ক্ষেত্রে পরীক্ষা করেও দেখা হচ্ছে। দেখা গিয়েছে দিনরাত্রির পরিমাণ কমিয়ে আনলে প্রতিটি প্রাণীরই বৃদ্ধি ভাল হয়। অকৃত্রিম সূর্যালোকও তাপমাত্রা বৃদ্ধির সবচাইতে বেশী সহায়ক।

হাতের রেখা দেখে কি করে কোন মানুষের কোন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায়।

দেখা গিয়েছে হাতের রেখার কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মানুষের কয়েকটি চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের বিশেষ সম্পর্ক আছে। এই রেখাগুলির অবস্থান ও জ্যামিতিক আকারের ওপরে এই বৈশিষ্ট্যগুলি যে নির্ভরশীল তা লেখকের একটি মডেল থেকে জানা যায়।

আসলে হাতের এই রেখাগুলির সঙ্গে দেহের কয়েকটি জিনের সম্পর্ক আছে। আবার আগেই বলেছি জিনগুলো দেহের এক একটি বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী। তাই বলা যায় এই বিশেষ রেখাগুলি, কয়েকটি আকৃতিগত ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের জন্য দায়ী।

গ্রহ, নক্ষত্রের সঙ্গে মানুষের জীবনের সম্পর্ক ও ভবিষ্যৎ গণনা।

দেহের বৃদ্ধির সঙ্গে ও মানসিক গঠনের সঙ্গে দেখা গিয়েছে শব্দ, আলোর রঙ, তাপমাত্রা, অভিকর্ষ বল, আবহাওয়া ইত্যাদি কারণগুলির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে প্রাণের সম্পর্ক এভাবে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত হয়ে আছে। আবার এই প্রকৃতি আমাদের পৃথিবী, বিভিন্ন গ্রহ, উপগ্রহ, সূর্য, চন্দ্র বিভিন্ন নক্ষত্র নিয়েই তৈরী। তাই কারো জন্মমুহূর্তে গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান, তাদের গতি, তাদের থেকে কি কি আলো, কি তাপমাত্রা, কি অভিকর্ষ বল ইত্যাদি এসে পৌঁছুচ্ছে তার কাছে-তা হিসেব করে ও তার মানসিক অবস্থা, তার পরিবর্তন ইত্যাদি বলা যায়। অবশ্য এভাবে ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে একটু সময় লাগবে আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রয়োজন এ ব্যাপারে।

অপরাধীর হাত ও অন্যান্যদের হাতের কোথায় তফাৎ ?

দেখা গিয়েছে এক একজন মানুষের এক একরকম হাত। কারো চৌকো, কারো গোলাকার, কারো লম্বা, আবার হাতের রেখা এক একজনের এক একরকম। এভাবে পায়ের রেখা ও পায়ের গঠনও এক একজনের এক একরকম। শ্রমিকদের হাত পা বেশ শক্ত হয়। শিল্পীর হাত নরম হয়। শিল্পীর বা বৈজ্ঞানিকের হাতের রেখার জটিলতাও বেশী। শ্রমিকদের হাতে রেখার জটিলতা বেশী নেই।

এভাবে জিভ দেখে, কান দেখে, চোখ দেখে ইত্যাদি দেখেও এক একজন মানুষ সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তাই শুধু হাতের উপর বা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থানের উপর নির্ভর করলেই চলবে না, সঙ্গে সঙ্গে চোখ, কান, জিভ, পায়ের রেখা ইত্যাদির উপরেও নির্ভর করতে হবে।

বায়োনিক্স কি ?

কয়েকটি ক্ষমতার দিক থেকে কিছু কিছু পশু-পাখী মানুষের চাইতেও এগিয়ে। এই ক্ষমতাগুলি কি কি, এর কারণগুলি কি কি, কি আকৃতির জন্য বা কি পদ্ধতিতে পশুপাখীরা এই বাড়তি ক্ষমতার অধিকারী তা সঠিকভাবে জেনে বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন ঐ ক্ষমতা-গুলি যান্ত্রিকভাবে বা অন্যভাবে করতে। এভাবে বিজ্ঞানের যে শাখাটি গড়ে উঠেছে তার নাম বায়োনিক্স।

তিমি অতবড় আকার নিয়েও জলে খুব দ্রুত যেতে পারে। তার কারণ তিমির দেহের বিশেষ আকার। এই আকৃতি-বিশিষ্ট জাহাজ তৈরী করে তাকে জলে দ্রুত চালাবার চেষ্টা চলছে। এভাবে আর একটি শাখার জন্ম হয়েছে। তার নাম সাইবারনেটিক্স-এর সাহায্যে মস্তিষ্ক সম্পর্কে গবেষণা অনেক এগিয়ে যাবে।

প্রকৃতির উপর প্রাণার আরও কয়েকটি প্রভাব কি কি ?

কলেরা বসন্তের ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। কালাজ্বরের ওষুধ তো আমাদের দেশের বিজ্ঞানী উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারীই বের করেছেন।

ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন আবিষ্কারও এদেশে বসেই হয়েছে। কয়েকটা সাধারণ রোগ যেমন জ্বর হলে ক্যালপল বা ক্রোসিন সিরাপ, গা ব্যাথা হলে নোভালজিন, মাথা ধরলে অ্যানালজিন, কাশি হলে বেনাড্রিল, পেট খারাপ হলে ইউনিএন্‌জাইম, আমাশা হলে এনটারোকুইনল ইত্যাদি যে খেতে হয় তা আজ প্রায় সবার জানা। কোন চর্মরোগে কি মলম লাগাতে হবে তাও সবার মুখস্থ।

আজ মানুষ ভালভাবে তাড়াতাড়ি পড়ার পদ্ধতি জানে, কি করে করে ভাল শেখা যায় তা জানে। হৃদপিণ্ড বদলও এখন কষ্টকর ব্যাপার নয়। সাপের কামড় খেলে কি করতে হয়, কোন ইন্‌জেক্‌শন দিতে হয় তা অনেকেই জানে। চিকিৎসাশাস্ত্রে গণিতের প্রয়োগ হচ্ছে। রোগীর শরীরের রেখাচিত্র এঁকে নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যাচ্ছে পরে কোন রোগ হতে চলেছে। কোন রোগ সারানো ঠিক হচ্ছে কিনা তাও নির্ভুলভাবে বলে দেওয়া যায়। আজকাল গাছ-গাছড়া থেকেও নানা ওষুধ তৈরী হচ্ছে যা অত্যন্ত ফলপ্রসু, হোমিওপ্যাথিও আয়ুর্বেদচর্চা খুব দ্রুত এগিয়ে চলেছে, কৃষিকাজে বিজ্ঞানের তো ব্যাপক প্রয়োগ হচ্ছে। অনেকে বেশী উন্নত ফসল ফলানো সম্ভব হচ্ছে। কোন খেলোয়াড় দেহের গঠন অনুসারে কোন খেলাতে গেলে বেশী ভাল ফল দেখাবে তাও আজকাল বিজ্ঞান-সম্মতভাবে ঠিক করা হচ্ছে। অবলুপ্তিপ্রায় অত্যন্ত মেধাবী উপজাতিদের বাঁচাবার চেষ্টা চলেছে। প্রোটিন সংশ্লেষণ নিয়ন্ত্রণও সম্ভব হতে চলেছে।

এবারে কিছু সংস্কারের কথা বলা যাক যেগুলো কুসংস্কার ছাড়া আর কিছু নয়ঃ—

১। 'মঙ্গলে উষা বুধে পা যথা ইচ্ছা তথায় যা'—খনা।

২। যাত্রাকালে ছেঁড়া কাপড়, ময়লা জিনিস সামনে দেখলে খারাপ।

৩। টিকটিকি শরীরের দক্ষিণে পড়লে ধন ও স্বজনহানি।

৪। শয়নে, ভোজনে, উপবেশনে, দানে, বিবাহে, বিবাদে, পরিধানের সময় হাঁচি শুভ।

৫। গরু হাঁচি দিলে গৃহস্বামীর মৃত্যু হয়।

৬। শকুন, কাক, কুকুর, শিয়াল যদি শ্মশানের অস্থি মাংস বাড়ীর সামনে ছড়ায় তবে সেই স্থান শ্মশানে পরিণত হয়।

৭। রাত্রে গরু ডাকলে, কুকুর কাঁদলে, শালিকে ঝগড়া করলে অমঙ্গল হয়।

৮। বৃষ্টির সময় রোদ উঠলে বলে শিয়ালের বিয়ে হয়।

৯। 'আখে ধান তেঁতুলে বান'—বন্যা নির্দেশক।

১০। মনসা পূজার সময় ঢাক বাজানো, ধূনো দেওয়া, কাঁসর ঘন্টা বাজানো নিষিদ্ধ।

১১। রাতে সাপের নাম উচ্চারণ করতে নেই।

১২। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের নিমগাছ এবং বেলগাছ কাটা এবং পোড়ানো খারাপ।

১৩। মৃত মানুষকে স্বপ্নে দেখলে বংশহানি হয়।

১৪। মাকড়সা গায়ে উঠলে নতুন বস্ত্রলাভ হয়।

১৫। বিড়াল মারলে সমপরিমাণ নুন দান করতে হয়।

১৬। গো-হত্যা করলে গরুর দড়ি গলায় নিয়ে বাড়ি বাড়ি ভিক্ষা করতে হয়।

১৭। বিছানায় ছোট ছেলেমেয়ে প্রস্রাব করলে অনেক অভি-ভাবকেরা শনি / মঙ্গলবার কুলকাঁটার আঘাত দেন।

১৮। শবযাত্রাকে ডানদিকে দেখলে শুভ হয়।

১৯। দুর্গাপূজার সময় বেশ্যাগৃহের মাটির দরকার।

২০। ঘরে প্রজাপতির আবির্ভাব হ'লে বিয়ে হয়।

২১। ঘরে মথের আবির্ভাব হ'লে কর্জ হয়।

২২। মাথায় উপর টিকটিকি পড়লে ধনবান হয়।

২৩। বহুরূপী দেখলে অনেকেই থুতু দেয়।

২৪। অনেকেই মাথার বালিশে ইষ্টনাম লেখে।

২৫। খাম বন্ধ করে অনেকেই খাপের উপর ৭৪৷৷০ লেখে।

২৬। হাই উঠলে তুড়ি দেয়।

২৭। দুধ উথলে পড়া ও তেল ঢালতে গিয়ে পড়া শুভ লক্ষণ।

২৮। হিন্দু-স্ত্রী স্বামী, ভাসুর ও শ্বশুরের নাম করে না।

২৯। রাস্তার পয়সা কুড়োলে ভিখারীকে দান করতে হয়।

৩০। খাওয়ার সময় বিষম খেলে বলে কেউ নাম করছে।

৩১। অন্ধকারে ছায়া দেখলে অসুখ হয়।

৩২। গৃহস্থের বাড়ীতে শকুন বসলে বৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়।

৩৩। গৃহস্থ বাড়ীতে পায়রা বা লক্ষ্মীপ্যাঁচা বসলে মঙ্গল হয়।

৩৪। হঠাৎ কোন পুরুষ কপালে সিঁদুর পড়লে দুর্ভিক্ষ হয়।

৩৫। যে সব নারীর খরম পা এবং কাঁধ পর্যন্ত চুল তাদের অলক্ষণীয়া বলে।

৩৬। রাত্রিতে মেয়েরা চুল আঁচড়ায় না, চুল বাঁধে না এবং আয়নায় মুখ দেখে না।

৩৭। যেখানে সেখানে মেয়েদের চুল ফেলা বারণ।

৩৮। মেয়েরা শাড়ি পড়ার সমর শাড়ির খুঁটে গিঁট দেয়।

৩৯। কোন জিনিস হারালে মেয়েরা আঁচলে গিঁট দেয়।

৪০। জন্মবার, বৃহস্পতিবার ও সংক্রান্তিতে অনেকেই চুল-নখ কাটে না।

৪১। জ্যৈষ্ঠমাসে ছোট ছেলের মা লাউ ও বেল, মাঘমাসে মূলো ও চৈত্রমাসে নিম খায় না।

৪২। রাত্রিবেলা ঘর ঝাড়ু দিয়ে বাইরে ফেললে চোরের যাত্রা শুভ হয়।

৪৩। রাত্রিবেলা গামছা বাইরে রাখে না।

৪৪। চাল, পান, মাছ ধোয়ার জল এক জায়গায় ফেলতে নেই।

৪৫। ঝাঁটা বা চটি উল্টো করে রাখতে নেই।

৪৬। দুটো ঝাঁটা বা লাঠি একসঙ্গে রাখতে নেই।

৪৭। কুলোর সামনে দাঁড়াতে নেই।

৪৮। পানের জল গায়ে লাগানো বারণ।

৪৯। মেয়েদের খাওয়ার সময় পা মেলে বসতে নেই।

৫০। কালি দিয়ে কোন জায়গায় দাগ দিতে নেই।

৫১। যাত্রাকালে শূন্য কলসী দেখা খারাপ।

৫২। শবযাত্রার হরিধ্বনি শুনলে থালার নীচে জল দিতে হয়।

৫৩। রাত্রিবেলা দোকানে সূঁচ, চুন, খয়ের বিক্রী করা হয় না।

৫৪। খাবার সময় হাঁচি দিলে খারাপ।

৫৫। অতিবর্ষণের সময় একমাত্র মেয়ে উঠানে একটি পিঁড়ি পেতে চুনের বৃত্ত আঁকলে বৃষ্টি থেমে যায়।

৫৬। কোন কোন ক্ষেত্রে ব্যাঙকে মেরে পোড়ালে বৃষ্টি বন্ধ হয়।

৫৭। অনেক সময় মেয়েরা 'একতারা নড়িঘড়ি, দুইতারা প্রাণে মারি, তিনতারা নাই ঠাঁই, তারারা কয় ভাই, তারা বিনে কেউ নাই'—এই বলে হাতের দড়িতে গিঁট দিলে বৃষ্টি বন্ধ হয়।

৫৮। ঘর তৈরী করার সময় ঝাঁটা, ঝুড়ি টানিয়ে রাখা হয়।

৫৯। বাঁ চোখের পাতা নাচলে বাঁ পায়ের ধূলো দেয়।

৬০। পায়ের তল চুলকালে যাত্রা, বাঁ হাতের তল চুলকালে পেট খারাপ, ডান হাতের তল চুলকালে টাকা হয়।

৬১। মাথায় টিকটিকি পড়লে শুভ হয়।

৬২। গরুর দড়ি ডিঙ্গাতে নেই।

৬৩। গামছা রোদে দিতে নেই।

৬৪। ছেড়া কাপড়-জামা সেলাই করতে নেই।

৬৫। হাত থেকে কিছু পড়ে গেলে বাড়িতে লোক আসে।

৬৬। এক শালিক দেখা দুঃখ, দুয়ে আনন্দ, তিনে চিঠি ও চারে খেলনা মেলে।

৬৭। রাত্রে বাইরের তিন ডাক শুনলে উত্তর দিতে নেই।

৬৮। বেশী সংখ্যায় চুনের ফোঁটা দিলে বাড়িতে আগুন লাগে।

৬৯। কেউ অসুস্থ থাকলে দুপুরে ভিক্ষে দেওয়া বারন।

৭০। বসন্তরোগ হ'লে মেয়েদের লালপেড়ে কাপড় পরা, মাথায় সিঁদুর দেওয়া, পান খাওয়া বারণ।

৭১। ছেলে হ'লে নয়, সাত ও ছয়, তিনবার উলু দেয়।

৭২। শিশুর ব্যাপারে মহিলারা আঙুল কামড়ানো এবং থুতু ছেটানো ইত্যাদি বহু সংস্কার মানেন।

৭৩। ঘরে নবজাতক আসার পর হিজড়ে এলে শুভ।

৭৪। 'যদি দেখ মাকুন্দ চোপা সেপথে না যেও চাপা'—খনা।

৭৫। নিঃসন্তান স্বামী-স্ত্রী যাত্রাকালে দেখা খারাপ।

৭৬। যাত্রাকালে হিজড়ে দর্শন অত্যন্ত শুভ।

যে সংস্কারগুলো ভেবে দেখা উচিত ঃ—

হিন্দুরা ধর্মের জন্য বহুরকম উপবাস করে।

এই সংস্কার কিছুটা সু। উপবাসে শরীর ভাল থাকে। পেটের পোকা মরে যায়।

ভূমিকম্পের সময় শাঁখ, ঘণ্টা বাজায়, উলু দেয়।

এই সংস্কার অন্যকে সতর্ক করার পক্ষে সু।

চিৎ হয়ে শুয়ে দুই পা জোড়া অবস্থায় এবং বুকে আড়াআড়ি হাত রেখে শোওয়া বারণ।

এটা কিছুটা সু। কারণ এতে শ্বাসপ্রশ্বাস ব্যাহত হয়।

মৃগীরোগীকে শুকনো, লঙ্কা, ব্লটিং পেপার, চামড়া-পোড়া গন্ধ শোঁকালে সুস্থ হয়।

কিছুটা সু সংস্কার। কারণ এতে রোগীর জ্ঞান তাড়াতাড়ি ফিরে আসে।

কুকুর মাত্রেই তুলসী গাছে প্রস্রাব করে।

পুরোপুরি সত্যি নয়।

আগেকার দিনে বিধবা অবস্থায় মেয়েদের মুণ্ডিত মস্তক বা স্বল্প চুল রাখা হত।

এটা কিছুটা সু সংস্কার। এর ফলে তার মন পবিত্র থাকত। অন্য পুরুষ দ্বারা আকর্ষিতও হতো না। এতে চরিত্র সুস্থ থাকত।

আজানুলম্বিত বাহু উত্তম পুরুষের লক্ষণ।

এটা অনেকটা সু সংস্কার। এটা লেখকের পরীক্ষিত সত্য (পরিসংখ্যানগতভাবে)।

বড় কান, বড় মাথা এবং উজ্জ্বল চোখ বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

এটা সত্যিই সু সংস্কার। এটাও লেখকের পরীক্ষিত সত্য। চোখের মধ্য দিয়েই মানুষের প্রকাশ সবচাইতে বেশি। অন্যান্য অংশের আকার দেখেও মানুষ সম্পর্কে অনেক কিছু বলা যায়।

জমিতে কাকতাড়ুয়া রেখে দেওয়া হয়।

এটা সু সংস্কার। কারণ এ দেখে পাখীরা ভয় পায় এবং শস্যের ক্ষতি করতে পারে না।

গলায় তিল থাকলে গান সম্পর্কে ধারণা থাকে।

এটা পরীক্ষিত সত্য নয়। পরীক্ষা করে তবে 'সু' না 'কু' বোঝা যাবে।

পেটে তিল থাকলে পেটুক হয়।

এটা ঠিক। এটা লেখকের পরীক্ষিত সত্য।

হৃদয়ের অপরাংশে তিল খুনী বা নৃশংসতার পরিচায়ক।

এটা পরীক্ষিত সত্য নয়। পরীক্ষা করে তবে সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তবে সত্য হতেও পারে।

ডান হাতের বুড়ো আঙ্গুল চ্যাপ্টা ও ভোঁতা হলে খুনী হবার সম্ভাবনা থাকে।

এটাও পরীক্ষিত সত্য নয়। পরীক্ষা করে তবে সিদ্ধান্তে আসা যাবে। তবে এটাও সত্য হতে পারে।

বুকের বাঁ পাশে তিল থাকলে হৃদয়বান হয়।

এটাও ঠিক। লেখকের পরীক্ষিত সত্য এটা—(পরিসংখ্যানগত ভাবে)।

স্বপ্নে সর্পদর্শনে সন্তান—বৃদ্ধি হয়।

এটা ঠিক সত্যি নয়। তবে স্বপ্নে সাপ দেখলে সাধারণতঃ তার কামভাবকে প্রকাশ করে। সেদিক থেকে সন্তান বৃদ্ধির সম্ভাবনা কিছুটা থাকে বৈকি।

দৈনন্দিন জীবনের টুকিটাকি সংশয় ঃ

(জামাকাপড়, তেল, সাবান, কসমেটিক্স, ব্যবহার্য সামগ্রী, খাবাড়-দাবাড়ের এবং ব্যবহৃত জিনিসের রঙ ইত্যাদি সম্পর্কে সংশয়।)

সিনথেটিক জামা-কাপড় ব্যবহার ঠিক কি?

আজকাল সিনথেটিক জামাকাপড় ব্যবহারের একটা বিশেষ প্রচলন আছে। তবে যারা ব্যবহার করে তাদের অনেকেই জানে না এটা শরীরের ত্বকের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকারক। এই ধরণের জামাকাপড় এমন অনেক রাসায়নিক পদার্থ দিয়ে তৈরী করা হয় যা ত্বকের সঙ্গে খুব উগ্রভাবে বিক্রিয়া করে ত্বকের মসৃণতা নষ্ট করে দেয় এবং বিভিন্ন ধরণের চর্মরোগ সৃষ্টি করে; বিশেষ করে গরমকালে জামা গায়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ঘামের জন্য। সেইজন্য সুতির জামা কাপড়ই পরা ভালো। এছাড়া গায়ে সুতির গেঞ্জি পরে তার ওপরে সিনথেটিক জামা পড়তে পার।

কসমেটিক ব্যবহার ভাল না খারাপ?

বাজারে এখন অনেকরকমের ক্রিম বা কসমেটিক্স পাওয়া যায়। এইগুলোর বেশীরভাগই ত্বকের কোন উপকার তো করেই না বরং অপকারই বেশী করে। তবে কিছু কিছু ক্রিম আছে যেগুলো সাময়িক কাজে দেয় তবে মাখা ছেড়ে দিলেই ত্বক আবার যেমন ছিল তেমন হয়ে যায়। অনেকের গায়ে সাদা সাদা ছোপ দেখা যায় এবং তারা বাজারে প্রায় সব ধরণের ক্রিম একবার করে লাগিয়ে ফেলে।

কিন্তু তাতে কোন কাজই হয় না এবং হওয়া সম্ভবও নয়। এইসব সাদা ছোপের সৃষ্টি হয় যখন শরীরে মেলাণিন (এক ধরণের জিনিস যা ত্বকের ঠিক নীচে থাকে এবং যার সাহায্যে ত্বকের রং হয়) কমে বা বেড়ে যায়। তাই এইসব ক্ষেত্রে ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

ত্বক ও চুলে সাবানের ব্যবহার ভাল না খারাপ?

খুব বেশী সাবানের ব্যবহার আমাদের ত্বককে রুক্ষ করে দেয়। সাবানে প্রধানতঃ ক্ষার থাকে যা ত্বকের ক্ষতি করে। কিন্তু আমাদের দেহ পরিষ্কার রাখার জন্য সাবান মাখতেই হয়। তাই রুক্ষতা রক্ষা করার জন্য আমাদের উচিত সাবান মাখার পর অল্প করে তেল মাখা বা ক্রিম মাখা, ভালো করে শরীর ধুয়ে ফেলার পর। এছাড়া চুলে শ্যাম্পু মাখার পরও ভালো করে ধুয়ে ম্যাসেজ করে তেল মাখা উচিত। এতে চুল নরম ও চকচকে হবে এবং চুলের গোড়া খুব শক্ত হবে। শ্যাম্পু খরচসাপেক্ষ বলে অনেকে আবার গুঁড়ো সাবান বা গায়ে মাখার সাবান মাথায় দেন। এটা চুলের ভীষণ ক্ষতি করে এবং চুল লাল হয়ে যায়। অনেক সময় চুল উঠেও যায়।

খাবারে রংয়ের ব্যবহার ভাল না খারাপ?

খাবারকে আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন খাবারের দোকানে রঙ্গিন খাবার তৈরী করে যা পেটের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। অতএব দেখতে সুন্দর খাবার দ্বারা প্রতারিত না হয়ে আমাদের উচিত ভালো সাদা রংয়ের খাবার খাওয়া। যেমন রঙ্গিন মিষ্টির পরিবর্তে সাদা মিষ্টি, রঙ্গিন আইসক্রীমের পরিবর্তে সাদা আইসক্রীম ইত্যাদি খাওয়া। রঙ্গিন খাবার তৈরীর জন্য আলাদা এক ধরণের রং কিনতে পাওয়া যায় যার খুব দাম এবং দোকানদার তা ব্যবহার না করে খারাপ সস্তা রং ব্যবহার করে। তাই রঙ্গিন খাদ্য আমাদের খাওয়া উচিত নয়।

গ্রীষ্মকালীন পোশাক-পরিচ্ছদ কোনটা ভাল কোনটা খারাপ?

গ্রীষ্মকালে রোদে বেরুবার সময় আমাদের উচিত সাদা অথবা যে কোন হাল্কা রংঙের (হলুদ, আকাশী, গোলাপি) ঢিলে পোষাক পরা এবং সেগুলি যেন সুতির হয় অবশ্যই। জামা পরার আগে গায়ে অল্প করে পাউডার ছড়িয়ে দিয়ে আলতো করে তুলিতে করে বোলান উচিত। এছাড়া হাল্কা রংয়ের ছাতা ব্যবহার আবশ্যক। তবে যুবক ছেলেদের উচিত চোখের চারপাশের নমনীয় ত্বক সানগ্লাস দিয়ে ঢাকা কারণ তাদের হাল্কা রংঙের ছাতায় মানায় না। এছাড়া গরম থেকে রেহাই পাবার জন্য রোদে বেরুবার ঠিক আগে যতটা পারা যায় ঠাণ্ডা জল খেয়ে নেওয়া ; এতে শরীর ঠাণ্ডা থাকে।

স্টেইনলেস স্টীল-এর ব্যবহার কি ভাল?

আজকাল হালকা ও ব্যবহারে সুবিধার জন্য স্টেইনলেস স্টীল-এর ব্যবহার বাড়ছে। আকরিক থেকে নিষ্কাশিত লৌহের সঙ্গে কার্বন, নিকেল, ক্রোমিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ ইত্যাদি নির্দিষ্ট অনুপাতে মিলিয়ে স্টেইনলেস স্টীল প্রস্তুত করা হয়। এতে তৈরী বাসনে কোন খাদ্যদ্রব্য উচ্চতাপে রান্না করলে অঙ্গারীভূত কার্বন ও খাদ্যের মধ্যে থাকা সালফার ও ফসফরাস লোহা ক্রোমিয়াম ও নিকেলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এতে ক্রোমিয়াম থাকে 10—12%। যে কোন ক্রোমিয়াম যৌগই শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। সুতরাং এই স্টীল-এর বাসনে রান্নাকরা খাদ্য আমরা গ্রহণ করি অর্থাৎ ক্রোমিয়াম যৌগগুলিও গ্রহণ করি।

স্টীল-এর বাসনগুলির পালিশ যত মসৃণ হবে এই ধরণের বিক্রিয়াগুলি তত কম হয়। সেক্ষেত্রে খাদ্যকণা বাসনের গায়ে আটকে থাকতে পারে না বলে এই বিক্রিয়াগুলি ঘটার সম্ভাবনা কম থাকে। তাই স্টীল-এর বাসন সর্বদা পরিষ্কার রাখা উচিত।

মসৃণ খাদ্য খাওয়ার ফল কি ভাল?

বর্তমানকালে শহরে মানুষেরা হৃদরোগ, ক্যানসার, ডায়াবিটিস,

স্থূলতা প্রভৃতি মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হয়। কিন্তু গ্রামাঞ্চলের লোকেরা ঐ ধরণের রোগে কম আক্রান্ত হয়। এর কারণ বৈজ্ঞানিক ভাবে নিশ্চয়ই দেওয়া যায়।

শহরে মানুষেরা খাদ্যের মধ্যে মসৃণ খাদ্য যেমন ময়দার রুটি, সরু চাল এছাড়া মাছ মাংস ডিম তো আছেই। গ্রামের লোকেরা বিভিন্ন রকমের শাকসব্জি, ঢেঁকিছাটা চাল, ইত্যাদি খাদ্য গ্রহণ করে। অর্থাৎ গ্রামাঞ্চলের লোকেরা এমন সব খাদ্য খায় যেগুলোতে ফাইবার বা তন্তু জাতীয় পদার্থ থাকে। এইতন্তু জাতীয় পদার্থগুলো আমরা হজম করতে পারি না। তাই গ্রামাঞ্চলের মানুষদের পায়খানার পরিমাণ বেশী হয়। আবার এই তন্তু জাতীয় পদার্থগুলি বিভিন্ন দৈহিক ধাতু-গুলির (কোলেস্টেরল) শোষণ কমিয়ে দেয়। এই শোষণের হ্রাসের মাত্রা বেশী হওয়া ভালো নয়। নির্দিষ্ট মাত্রাতে থাকা ভালো। কিন্তু শহরে মানুষদের ক্ষেত্রে মসৃণ খাবার খাওয়ার জন্য শোষণ খুব বেশী হয়। তাই পায়খানার পরিমাণও কম হয় ও কোষ্ঠকাঠিন্য রোগে ভোগে এবং অতিরিক্ত শোষণের জন্য শরীরে চর্বি-জাতীয় পদার্থ জমে। কোষ্ঠকাঠিন্য মলাশয়ে ক্যানসার রোগের সূত্রপাত করে ও হৃদরোগে আক্রান্ত হতে সাহায্য করে। অতিরিক্ত চর্বি স্থূলতাও ডায়াবিটিস রোগের কারণ।

মোটরগাড়ীতে রং লাগানো ভাল?

মোটরগাড়ীতে রং লাগিয়ে রংচঙ্গে করা হয়। এর ফলে মোটর গাড়ী দেখতে সুন্দর হয়। কিন্তু শুধু এই সুন্দর লাগার জন্য মোটর গাড়ীতে রং লাগানো হয় না।

মোটরগাড়ীর দেহটা ধাতুর তৈরী। এই ধাতু বায়ুর সংস্পর্শে ও ধূলোবালির উপস্থিতিতে বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। যার ফলে কমদিনের মধ্যেই দেহ ক্ষয় হয়। এই ক্ষয়ের হাত থেকে মোটর

গাড়ীকে বাঁচাবার জন্য খুব দামী জৈব রঞ্জক পদার্থের প্রলেপ দেওয়া হয়।

আলুতে রং মাখানো ও পটলে রং মাখানো শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর ?

আলুর গায়ে আজকাল একপ্রকার লালাভ রং মাখিয়ে বাজারে বিক্রী করা হয়। এই রং আসলে ইটের গুঁড়া বা লাল মাটি। আলুর ছালে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র থাকে। ততোধিক সুক্ষ্ম ইটগুঁড়া আলুর খোসা ভেদ করে কিছুটা প্রবেশ করে। এখন ঐ আলুকে যখন আমরা খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করি তখন আমরা এই আলুকে উপযুক্ত করে যতই পরিষ্কার করি না কেন ঐ ইট গুঁড়াগুলিকে অপসারিত করা যায় না। ঐ কণাগুলো খাদ্যের সঙ্গে পাকস্থলীতে যায় ও সেখানে পাথর হিসাবে জমা হয়। সেজন্য খোসা না ছাড়ানো আলু খাওয়া আরোও বিপজ্জনক।

পটলকে তুঁতে জলে ডুবিয়ে রং করা হয়। এতে পটলকে টাটকা সবুজ মনে হয়। তুঁতে আমাদের শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। তুঁতে পটলের সছিদ্র খোসা ভেদ করে ভিতরে প্রবেশ করে। পটল রান্না করার সময় এই তুঁতে সালফারের (খাদ্যদ্রব্যে থাকা) সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক যৌগ গঠন করে। এগুলি আমরা খাদ্যের সঙ্গে গ্রহণ করি। এই পদার্থগুলি ধীরে ধীরে আমাদের শরীরের ক্ষতি করে। ফলে আমরা পেটের অসুখে ভুগি।

মনের উপর রঙের প্রভাব, কোনটা ভাল কোনটা খারাপ ?

ফর্সা সুগঠিত মেয়েদের যে কোন রঙের পোশাকেই মানিয়ে যায়। কালো রঙের শান্ত ধরণের মেয়েদের পক্ষে উজ্জ্বল রংও যেমন বেমানান তেমনি স্নিগ্ধ রংও খ্যাটখ্যাটে। সেক্ষেত্রে শ্যামবর্ণের হালকা উজ্জ্বল রঙের পোশাক পরিধান করা উচিত। ঘিয়ে রং, হালকা বিস্কুট রং, ফিকা সবুজ রং, ফিকা হলুদ রংয়ের পোশাক

শ্যামবর্ণ মহিলাদের পক্ষে ভাল। তাতে ঐ রকম মেয়েদের মনের জড়তা দূর হয়, দেহে ও মনে সাবলীলতা আসে। কিন্তু ঐসব শ্যামবর্ণ মেয়ে যদি কালো বা কোনো গাঢ় রং-এর পোশাক পরে তবে তাদের আরোও নিস্তেজ ও ম্লান লাগে। হাসি-খুশি মেয়েদের লাল হলুদ প্রভৃতি গাঢ় রংয়ের পোশাক পরা ভালো।

বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে মেয়েদের পোশাকের রঙে পরিবর্তন ঘটানো দরকার। বেশী বয়সে উজ্জ্বল রংয়ের পোশাক পরলে হাস্যকর মনে হয়। বেশী বয়সে সাদা রঙের শাড়ী পরলে দেহ ও মনে একটি শুচিতা ও সাত্বিকতার ভাব আসে। শাড়ীর রং এমন হওয়া উচিত যা দর্শক ও পরিধান-কারিনীর উপর সমান প্রভাব বিস্তার করে। ধবধবে শুভ্র কাপড়জামা পরলে মনে সত্যই একটি সাত্বিকভাবের উদয় হয়। আবার রঙ্গিন পোশাক পরলে মনে রাজসিক ভাবের উদয় হয়।

রাত্রে দূরের কোন পুকুরে ভূতের আগুন জ্বলার সংশয়।

অনেক সময় রাত্রে দেখা যায় যে দূরের কোন পুকুরের জলের উপর আগুন জ্বলছে। দাদু, দিদিমারা আমাদের ছোটবেলা বলতেন ওগুলো ভূতের আলো। ভূত আলো জ্বালে। আমরা ছোটবেলা তাতে প্রচণ্ড ভয় পেতাম। আসলে এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটা একটু অন্যরকম। একটু খোঁজ-খবর করে দেখলেই বোঝা যাবে যে ঐ পুকুরের জল পঁচে গেছে। জলে পানা পঁচে গেলে বা অন্য কোন জলজ উদ্ভিদ পঁচে মিথেন গ্যাস প্রস্তুত করে। এই মিথেন গ্যাস বায়ুর সংস্পর্শে জ্বলে। এই জ্বলন্ত অবস্থা আমরা দিনের বেলা দেখতে পাই না। রাত্রেই এই আগুন আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়।

ভূতে পাওয়া ও 'নিশি ডাকা'র সংশয়।

অনেক সময় দেখা যায় কোন কোন ব্যক্তি ঘুমের মধ্যে দরজা খুলে যেদিকে সেদিকে চলে যায়। সাধারণ লোকেরা বলে এক

প্রকার প্রেত ওকে ভর করে নিজের মত করে চালায়। আবার অনেকে ভুল বকে। তখন লোকে বলে একে ভূতে ধরেছে। ওঝা ডেকে ভূত ছাড়াবার চেষ্টা করার ঘটনা অনেক প্রচলিত। আসলে কিন্তু এগুলি কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের অভিমত।

এর বিশেষ বৈজ্ঞানিক যুক্তি আছে। কটি ক্ষেত্রে এটা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে রোগটির নাম সোমনাথ-বলিজম।

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে মানুষ অবচেতন অবস্থায় নানা ঘটনাকে বিশ্রামরত স্নায়ুতন্ত্রে অবদমিত করে। এই অবদমিত ঘটনাগুলির বহিঃপ্রকাশ ঘটলে তাকে 'ভুলবকা' বলে।

রাহু সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করে তাই সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়— এই সংস্কারের সত্যতা কতখানি?

প্রাচীন বয়স্ক মানুষদের কাছে শুনতে পাই যে দেবতা ও দানব মিলে সমুদ্র মন্থণ করে যে অমৃত সংগ্রহ করে দেবতারা চক্রান্ত করে সেই অমৃত শুধুমাত্র দেবতাদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়ার সময় রাহু লুকিয়ে দেবতাদের সারিতে গিয়ে অমৃতের ভাগ নেয় ও খেয়ে ফেলে। কিন্তু সেই মুহূর্তে সূর্য ও চন্দ্র তা বুঝতে পেরে নারায়ণকে জানায়। তখন নাকি নারায়ণ তাঁর সুদর্শন চক্র দ্বারা রাহুর মাথা কেটে নেয়। অমৃত তখন রাহুর গলা পেরিয়ে পেটে যেতে পারে নি। তাই তার গলার উপরের অংশটা অমর। রাহু রাগে সূর্য ও চন্দ্রকে গ্রাস করেছিল। এই থেকেই নাকি সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ হয়।

আসলে তা নয়। সূর্যের চারিদিকে ঘোরে পৃথিবী। পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে চন্দ্র। যখন সূর্য, পৃথিবী ও চন্দ্র একই সরলরেখায় আসে তখন সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয়। সূর্য ও পৃথিবীর মাঝখানে চন্দ্র এলে আমরা সূর্যকে দেখতে পাই না সেক্ষেত্রে সূর্যগ্রহণ হয়। চন্দ্র ও সূর্যের মাঝখানে একই সরলরেখায় পৃথিবী এলে আমরা চন্দ্রকে দেখতে পাই না। এক্ষেত্রে চন্দ্রগ্রহণ হয়।

ঋতু অনুযায়ী পরিচ্ছদের রং কেমন হওয়া উচিত? কোনটা ভাল কোনটা খারাপ?

বিভিন্ন তন্তু যেমন উত্তাপ ও আলোক পরিবহন বা আত্মস্থ করে, তেমনি কাপড়ের বিভিন্ন রংও উত্তাপ এবং আলোক আত্মস্থ বা বিকীর্ণ করে। সেজন্য আবহাওয়া অনুযায়ী ঋতুভেদে বিভিন্ন রংয়ের পোশাক নির্বাচন করতে হয়। সাদা, সুতি, রেশমের বস্ত্র সূর্যের আলোক এবং উত্তাপ আত্মস্থ না করে প্রতিহত করতে পারে বলে। যদি গ্রীষ্মকালে সাদা রঙের ঐ জাতীয় তন্তুর পোশাক পরিধান করা যায়, তাহলে দেহ অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা বোধ হয় এবং বেশ আরাম লাগে। আবার গভীর কালো বা নীল রং সূর্যের আলোক বা উত্তাপ দুইই আত্মস্থ করে বলে ঐ দুই রং-এর পোশাকে সাধারণত গরম বোধ হয়। এই জন্যই শীতকালে নীল বা কালো রং-এর পোশাক পরিধান করা উচিত। যে কোন গভীর রঙের পোশাক উত্তাপ ও আলোক আত্মস্থ করে। সেইজন্যই শীতকালে ঘন গাঢ় রঙের জামা পরতে হয় এবং গ্রীষ্মকালে হালকা ফিকা রঙের জামা পরা উচিত।

গ্যাসের উনুনের জন্য কি কি সাবধানতা দরকার?

বর্তমানে গ্যাসের উনুনের ব্যবহার গৃহস্থালীর রান্নাবান্নার কাজে অনেক সুবিধা এনে দিয়েছে। কিন্তু সেসঙ্গে গ্যাসের উনুন ব্যবহারে কয়েকটা বিপদের সম্ভাবনাও থেকে যায়। যেমন আগুন লেগে সিলিণ্ডার ফেটে যাওয়া ইত্যাদি। নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বিপদের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়ঃ

গ্যাসের উনুনকে রাখতে হবে উঁচু একটা প্ল্যাটফর্মের ওপর।

উনুন বন্ধ করার সময় প্রথমে সিলিণ্ডারের ভাল্ব বন্ধ করতে হবে ও পরে উনুনের সরবরাহ বন্ধ করতে হবে।

উনুন জ্বালবার আগে ভালভাবে শ্বাস নিয়ে দেখতে হবে যে দুর্গন্ধযুক্ত গ্যাস বেরুচ্ছে কিনা। গ্যাস বেরুলে তখনি আগুন জ্বাললে বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে।

উনুনের ধোঁয়া শরীরের পক্ষে ক্ষতিকারক কেন ?

উনুনের ধোঁয়ার মধ্যে সাধারণত যে যে গ্যাস থাকে তার মধ্যে আমাদের দেহের তথা ফুসফুসের পক্ষে সবচেয়ে ক্ষতিকারক পদার্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কার্বন মনোক্সাইড (CO), কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), সালফার ডাই-অক্সাইড (SO_2), নাইট্রোজেন মনোক্সাইড (NO), নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড (NO_2) ইত্যাদি। এইজন্যই উনুনের ধোঁয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এছাড়া ধোঁয়ার ধুলিকণাও ফুসফুসের পক্ষে ক্ষতিকর।

সাধারণত ধোঁয়ার হাত থেকে বাঁচার জন্যে চুল্লী উনুন ব্যবহার করা ভাল। এতে আঁচ ওঠার সময় যে ধোঁয়া বের হয় তা নলের মধ্য দিয়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। এতে তাই ধোঁয়ার বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ার ভয় থাকে না।

গাছপালা বেশী কাটা উচিত নয় কেন ?

আমাদের চারপাশে যে বায়ুমণ্ডল রয়েছে তাতে রয়েছে আমাদের জীবন ধারণের উপযোগী অক্সিজেন গ্যাস—যা ছাড়া আমরা শ্বাসকার্য চালাতে অক্ষম। বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ প্রায় 20·6% ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ প্রায় 0·4%। কিন্তু শ্বাসকার্যের ফলে অনবরত অক্সিজেনের ব্যয় হলেও গাছ বায়ুর এই অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য বজায় রাখে। গাছ সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে জীব-জগতের খাদ্য প্রস্তুত করে ও অক্সিজেন উৎপন্ন করে। এইভাবে গাছ বায়ুতে অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভারসাম্য স্থিতিশীল রাখে।

এছাড়া গাছ পরিবেশকে শীতল রাখে ও বৃষ্টিপাত নিয়ন্ত্রণ করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে সুপ্রাচীন সিন্ধু সভ্যতার ধ্বংসের অন্যতম কারণ কিন্তু বৃক্ষচ্ছেদন। এক কথায় বলা যায় যে গাছ আমাদের পরিবেশ-দূষণ রোধের এক দুর্ধর্ষ হাতিয়ার। তাই মানুষের নিজের আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই বেশী গাছ কাটা অনুচিত।

অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া কাটাফল বা আঢাকা খাবার খাওয়া বা নোংরা হাতে খাওয়া উচিত নয় কেন ?

অনেকক্ষণ রেখে দেওয়া কাটাফল বা আঢাকা খাবারের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের রোগ-জীবাণুর সংক্রমণ হতে পারে। সেইজন্যই কাটাফল বা আঢাকা খাবার খাওয়া উচিত নয়। আর নোংরা হাতে খেলে হাতের নোংরা থেকে পেটের অসুখ করার সম্ভাবনা থাকে।

ক্যালপল, ডাইজিন, নোভালজিন, কোল্ডারিণ ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া বেশী খাওয়া উচিত কি ?

ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া এইসব ওষুধ বেশী খাওয়া ঠিক নয়।

সকালে উঠে এককোয়া রসুন খাওয়া ভাল কেন ?

এতে হার্ট ভাল থাকে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগে না। শ্বাস-প্রশ্বাস ভাল থাকে। এছাড়া নানা উপকারিতা আছে এর।

মধু খাওয়ার উপকারিতা কি ?

বিদ্যার্থীদের পক্ষে মধুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মধুর মধ্যে যে শর্করা-জাতীয় পদার্থ থাকে তার মধ্যে একটা বিরাট অংশ হল ফ্রুকটোজ। ফ্রুকটোজ সরাসরি শোষিত হয় ও মস্তিষ্কের পক্ষে ফ্রুকটোজ-এর প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত বেশী। এছাড়া মধুর মধ্যে অল্প পরিমাণ লেসিথিন থাকে। এই লেসিথিন আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। এই লেসিথিন দেহের অভ্যন্তরে ফসফোরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় ফসফোলেসিথিন তৈরী করে। এই ফসফোলেসিথিনই আমাদের স্নায়ুতন্ত্রের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধিতে অংশ নেয়।

চা খাওয়ার অপকারিতা কি ?

চা-এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে কেফিন থাকে। ঐ কেফিন আমাদের মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলোকে অবসাদগ্রস্ত করে তোলে ও এইভাবে মস্তিষ্কের ক্ষতি করে।

কাঁচাকলা, আপেলে কি আয়রণ বেশী থাকে ?

আসলে কাঁচাকলা বা আপেলে এক ধরণের টিনজাত যৌগ থাকে। ঐ ফলকে কেটে বায়ুর অক্সিজেনের সংস্পর্শে রাখলে বায়ুর অক্সিজেন-এর দ্বারা জারিত হয়ে ঐ টিনজাত যৌগ লালচে বর্ণ ধারণ করে। সেইজন্যে আমরা ধারণা করি যে কাঁচকলায় প্রচুর আয়রণ থাকে।

টেরিলিন বা টেরিকটের জামা-কাপড় পরা ভাল না খারাপ ?

টেরিলিন বা টেরিকটের কাপড় তৈরী হয় যে সূতো দিয়ে সেই সূতো আসলে তৈরী একধরণের পেট্রোলিয়ামজাত বা কৃত্রিম রাসায়নিক পলিমার দিয়ে—ফলে এই সিন্থেটিক সূতোর ঘাম বা জল শোষণ করার ক্ষমতা একেবারেই থাকে না।

এদিকে স্থান-কাল নির্বিশেষে সবসময়েই আমাদের দেহে স্বেদ-নিঃসরণ ঘটে ; এছাড়াও দেহের আরও একপ্রকার গ্রন্থি সেবাসিয়াস গ্রন্থি থেকে সিবাম নামে অতিরিক্ত একটা তৈলাক্ত ক্ষরণও নিঃসৃত হয়। এই সকল চর্মীয় নিঃসরণ টেরিলিন বা টেরিকটের জামা শোষণ করতে পারে না, ফলে ত্বকে অস্বস্তি হয় ও সময়ে সময়ে চর্মরোগ দেখা দেয়।

তবে সূতির গেঞ্জীর উপর সিন্থেটিক কাপড়ের জামা পরলে এই ধরণের অসুবিধা থাকে না।

সিন্থেটিক কাপড়ের জামা পরার আরও একটা অসুবিধা হল এই যে এই জামার কাপড়ের বুনটের মাঝে যে ফাঁক থাকে ঘামের লবণ ও রাসায়নিক পদার্থ সেই ফাঁক বন্ধ করে দিয়ে বায়ু চলাচল বন্ধ করে দেয় এবং সূর্যালোকের উপস্থিতিতে সিন্থেটিক ফাইবার আমাদের ত্বকের সঙ্গেও বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে।

সূতীর জামাকাপড় পরিধানের উপযোগিতা।

সূতীর জামাকাপড় তৈরীতে যে কাপড় লাগে তা তৈরী হয় উদ্ভিজ্জ ফাইবার তুলা থেকে। তুলার স্বাভাবিক জলশোধনের ক্ষমতা

আছে; তাই তুলোর স্থতোর জামা পরলে ঘাম বা সিবাম খুব সহজেই শোষণ করে নেয়। ফলে চর্মের ওপর রেচনজাত পদার্থের বিরূপ প্রতিক্রিয়া ঘটে না। এছাড়া স্তীর কাপড়ে অসংখ্য ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ছিদ্র থাকায় বায়ু চলাচলেও কোনো বাধা থাকে না। তাই স্তীর জামা পরা সবচেয়ে স্থবিধাজনক।

উলের জামাকাপড় শরীরের পক্ষে ভাল না খারাপ?

উলের জামাকাপড় পরার সঙ্গে শরীরের কোনো বিরোধ নেই। যদিও উলের সোয়েটার বা অন্যান্য পোশাক বর্তমান সিন্থেটিক উল দিয়েই তৈরী হয়। তবুও ঐ পোশাকের মধ্যে বায়ু চলাচলের পর্যাপ্ত পথ থাকায় এবং ঐ পোশাক সাধারণত বহির্বাস হিসাবে ব্যবহৃত হওয়ায় দেহের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে না আসায়; দেহত্বকের কোনো ক্ষতিসাধন করে না। এছাড়া শীতকালে দেহের উত্তাপ বজায় রাখতে উলের পোশাকের উপযোগিতা তো অনস্বীকার্য।

গরমকালে কোন রঙের জামাকাপড় পরা সবচেয়ে ভাল?

গরমকালে সাধারণত হালকা রঙের পোশাক (বিশেষতঃ সাদা) পরিধান করাই সবচেয়ে স্থবিধাজনক। আমাদের ভারতবর্ষের মত দেশে, বিশেষতঃ নিরক্ষীয় অঞ্চলে গরমকালে সূর্যের তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়। গাঢ় রঙের পোশাক পরিধান করলে ঐ পোশাক সূর্যের তাপ বেশী শোষণ করবে কিন্তু হালকা রঙের পোশাক, বিশেষতঃ সাদা রঙের পোশাক সূর্যের তাপ কম শোষণ করবে। সেইজন্য দেহ শীতল থাকবে। এই কারণেই গরমকালে হালকা রঙের পোশাক পরিধান করা উচিত।

গরমকালে কিছু পরে থাকা আরামপ্রদ না কিছু না পরেথাকা আরামপ্রদ?

গরমকালে গায়ে কিছু হালকা ও হালকা রঙের পোশাক পরে থাকাটাই বেশি আরামপ্রদ। ভারতবর্ষের মত নিরক্ষীয় দেশে যেখানে ঘাম হয় অত্যন্ত বেশী (বায়ুর আর্দ্রতা বেশী থাকার জন্য)

সেই সবস্থানে পরিধানে কিছু হালকা পোশাক থাকলে শরীর ঘামে চপচপ করে না এবং তাতে অস্বস্তির ভাবও অনেকটা কমে যায়। অপরপক্ষে খালি গায়ে থাকলে গায়ে ঘাম চপচপ করে ও তাতে অস্বস্তি যে বেড়ে যায় সেকথা বলাই বাহুল্য।

আবার যেসকল স্থানে আর্দ্রতা অনেক কম সেখানে গরমের সরাসরি আক্রমণ থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্যেও বেশ মোটা ধরণের পোশাক পরিধান করা উচিত। এ প্রসঙ্গে অনেকেরই হয়তো মনে পড়বে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও গরমকালে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন গরমচাদর ব্যবহার করতেন। কারণটা অবশ্যই শেষোক্ত ব্যাখ্যা দিয়েই চিন্তা করে নিতে হবে।

গরমকালে আমরা বেশী ঘামি কেন? যারা বেশী ঘামে তাদের কি করা উচিত ও কি খাওয়া উচিত?

আমাদের দেহের বিপাকীয় কার্য সম্পন্ন করার জন্য দেহকোষের একটি সর্বোত্তম উষ্ণতায় থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু গরমকালে পরিবেশের অত্যধিক উষ্ণতার জন্য দেহের উষ্ণতা সর্বোত্তম উষ্ণতা ছড়িয়ে যায় সেইজন্য সর্বোত্তম উষ্ণতা স্থির রাখবার জন্য ঘাম বেরোয়। ঐ ঘাম আমাদের দেহের উত্তাপ গ্রহণ করে বাষ্পীভূত হয়, ফলে দেহ শীতল হয়।

সাধারণতঃ উষ্ণ আবহাওয়ায় আমাদের দেহ দিনে 300—500 ml ঘাম ত্যাগ করে ও ঐ ঘর্মের মাধ্যমে প্রায় 200—300 ক্যালরি তাপ বিমোচন করে, ঐ তাপ স্বেদ বিন্দুর বাষ্পীভবনের লীনতাপ হিসাবে পরিবেশে যুক্ত হয়।

আমাদের দেহে এরকম অসংখ্য ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে। দেহের ত্বকের প্রতি বর্গসেন্টিমিটার স্থানে প্রায় 200—400 টি ঘর্মগ্রন্থি রয়েছে। অত্যধিক গরমে আমাদের দেহের অভ্যন্তরভাগ প্রভাবিত হলে মস্তিষ্ক কোলিনার্জিক সিমপ্যাথেটিক নার্ভ-এর মাধ্যমে স্বেদগ্রন্থিকে নির্দেশ দেয় তখন ঘাম বেরোনোতে দেহত্বক শীতল হয়। আমাদের

ঘামের মধ্যে সাধারণতঃ থাকে NaCl, ইউরিয়া, ল্যাকটিক অ্যাসিড, ক্রিয়াটিন, ইউরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়া, কয়েকপ্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড, গ্লুকোজ, ভিটামিন-B, ভিটামিন-C ইত্যাদি। এর মধ্যে কেবলমাত্র NaCl-এর পরিমাণই খুববেশী থাকে।

কি খাওয়া উচিত ও কি করা উচিত ঃ গরমকালে যারা বেশী ঘামে তাদের শরীর থেকে অত্যধিক জল বেরিয়ে যাওয়ায় তাঁরা সহজেই দুর্বল হয়ে পড়েন—সেই সময় তাঁদের বেশী করে জল খেতে হবে। সম্ভব হলে জলের সঙ্গে কিছু কিছু ইলেকট্রোল, পেডিট্রাল, ইত্যাদি মিশিয়ে খাওয়া ভাল।

সবসময় এটা কেনা সম্ভব না হলে বাড়ীতেও নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে ঐ মিশ্রণ তৈরী করে নেওয়া যায়।

1 লিটার জল $+\frac{1}{4}$ চামচ নুন $+\frac{1}{4}$ চামচ সোডি-বাই-কার্ব,-
$+ 2$ চামচ চিনি (সবচেয়ে ভাল হলো মধু)
$+\frac{1}{2}$ কাপ লেবুর রস।

এছাড়াও রোদে বেশী বেরোনো ভাল নয়। দিনে যতবার সম্ভব ঠাণ্ডাজলে গা-হাত-পা ধুতে হবে ও অনেকবার স্নান করতে হবে।

আমাদের দেহত্বক শীতকালে ফাটে কেন? এরজন্য কি করা উচিত?

আমাদের দেহত্বক অনেকগুলি স্তর নিয়ে গঠিত ও প্রতিটি স্তর গঠিত অসংখ্য কোষের সমন্বয়ে। ত্বকের সর্বাপেক্ষা ওপরের অংশকে বলা হয় বহিঃস্তবক; এই অংশ স্তরীভূত আবরণী কলা দিয়ে গঠিত। বহিঃস্তবকের ঠিক নিচে রয়েছে মূল স্তবক, বহিঃস্তবকের ওপরের অংশে কোন রক্তপ্রণালী নেই কিন্তু মূল স্তবকে রক্তপ্রণালী থাকে।

শীতকালে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ার জন্যে দেহত্বকের বহিঃস্তবকের কোষ দ্রুত জলহীন হয়ে পড়ে ও শুষ্ক হয়ে ওঠে। যে হারে দেহের ত্বক থেকে জল বাষ্পীভূত হয়, ঠিক সেই হারে দেহ ঐ কোষে জল

সরবরাহ করতে না পারায় কোষগুলি মারা যায় ও ত্বক ফাটা ফাটা বলে মনে হয়।

সাধারণতঃ কোষস্থ জলের বাষ্পীভবণ রোধ করার জন্য তৈলাক্ত আবরণ বা জলগ্রাহী পদার্থের আবরণ যেমন গ্লিসারিন ব্যবহার করা যেতে পারে।

বর্ষাকালে সর্দি-কাশির হাত থেকে কিভাবে বাঁচা যায় ?

বর্ষাকালে সাধারণতঃ যে রোগ সবচেয়ে বেশী হয় তা হলো ইনফ্লুয়েঞ্জা ও সর্দিজ্বর। নিম্নোক্তভাবে প্রতিরোধ (prevention) নিলে ঐ রোগকে এড়ান যায় ঃ—

i) বৃষ্টিতে ভিজে গেলে নিরাপদস্থানে পৌছবার পর ভিজে জামা-কাপড় তাড়াতাড়ি বদলে গা-মাথা শুকনো করে মুছে ফেলতে হবে। সম্ভব হলে গরম সেঁক দিতে হবে গলা ও বুকে।

ii) নিয়মিত বাসক পাতার রস বা উচ্ছে বা সজনে ডাঁটা খাওয়া উচিত।

iii) চামড়ার জুতো পরা ঠিক নয়। হাওয়াই চটি বা ঐ জাতীয় রবারের চটি ব্যবহার করা ভাল।

iv) জামা-কাপড় দু-একদিন রেখে দিলেই ছত্রাক জন্মায়। ছত্রাক ধরা জামা-কাপড় পরা ঠিক না।

v) সবচেয়ে ভাল হল বৃষ্টিতে না ভেজা। ছাতা বা বর্ষাতি ব্যবহার করা দরকার।

এয়ার কণ্ডিশান ঘরে থাকা কি সত্যিই ক্ষতিকর ?

সত্যিই এয়ার কণ্ডিশান বা বাতানুকুল ঘরে থাকা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। এয়ার কণ্ডিশান করা ঘরের মধ্যে বাতাস আবদ্ধ থাকায় বাতাসে ক্রমশই কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এর ফলে মাথা ধরা, শ্বাসকষ্ট ইত্যাদি দেখা যায়। এমনও দেখা গেছে যে, মাথা ধরার পর এয়ার কণ্ডিশান ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরের পরিবেশে আসার কিছুক্ষণের মধ্যেই মাথাধরা সেরে যাচ্ছে।

শীতকালে কি কি রঙের জামা-কাপড় পরা সবচেয়ে ভাল ?

শীতকালে গাঢ় রঙের (বিশেষতঃ কাল রঙের) পোশাক পরাই সবচেয়ে ভাল। কারণ গাঢ় রঙ তাপের সবচেয়ে ভাল বিশোষক হওয়ায়, গাঢ় রঙের পোশাক বেশী গরম হয় ; হালকা রঙের পোশাকের চেয়ে। সেইজন্যেই শীতকালে গাঢ় রঙের পোশাক পরা সবচেয়ে ভাল।

কম্বল বা লেপ কোনটি বেশী গরম ?

লেপ তুলো দিয়ে তৈরী ও এই তুলো কাপড়ের আবরণের মধ্যে থাকে, ফলে লেপের মধ্যে কম্বলের চেয়ে বেশী বায়ু থাকে ও বায়ু বেশী আবদ্ধ থাকে। এই আবদ্ধ বায়ু তাপের কুপরিবাহী বলে লেপ, কম্বলের চেয়ে বেশী গরম বলে অনুভূত হয়।

যাদের শুকনো চামড়া তাদের কোন্ ক্রিম মাখা সবচেয়ে ভাল ?

যাদের শুকনো চামড়া তাদের সাধারণতঃ মায়েস্টারিনং ক্রিম লাগানো উচিত। তাতে ত্বক ভিজে ভিজে ও তৈলাক্ত উভয়ই থাকে। ফলে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকে।

পাউডার মাখা খারাপ কি ?

সাধারণতঃ গরমকালে ঘাম শোষণ করে নেবার জন্যে পাউডার মাখা হয়। কিন্তু পাউডারের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কণা ঘামগ্রন্থির নিঃসরণ মুখ বন্ধ করে দেবার ফলে ঘামনিঃসরণ ব্যাহত হয়। এতে ত্বকের ক্ষতি হয়। সেইজন্যে পাউডার না মাখাই ভাল। তবে ঘামাচি ভাল করার জন্যে বোরিক অ্যাসিড্ যুক্ত পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে।

দাঁত মাজার সময় কোনদিকে খেয়াল রাখা উচিত ?

দাঁত মাজার সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির ওপর লক্ষ্য রাখতে হবে :

i) মাজন যেন করকরে না হয়। কারণ তাতে দাঁতের মাড়ি ছড়ে যেতে পারে।

ii) মাড়িকে হাতের আঙুল দিয়ে ভালভাবে ম্যাসেজ করতে হবে।

iii) ব্রাশ দিয়ে দাঁতের ফাঁকে জমে থাকা খাবারের টুকরোকে বের করে ফেলতে হবে।

iv) মাজনে ফ্লোরাইড যৌগ থাকলে ভাল হয়। (মনে রাখা প্রয়োজন যে ফ্লোরাইড বেশী ব্যবহার করা দেহের পক্ষে ক্ষতিকারক। কারণ এটা বিষাক্ত।)

কানের যত্ন কিভাবে নেওয়া উচিত ?

কানের যত্ন নিম্নলিখিতভাবে নেওয়া উচিত ঃ—

i) সর্দি-কাশিকে অবহেলা করা ঠিক না। কারণ অনেকদিন ধরে সর্দি-কাশি চললে কানে পুঁজের সৃষ্টি হতে পারে।

ii) খুব বেশী আওয়াজ কানের পক্ষে ক্ষতিকর। শান্ত জায়গায় থাকা ভালো। পাড়া বা গ্রামের অনুষ্ঠানে মাইক খুব জোরে চালানো ঠিক হয়। জোর আওয়াজ সবার কানের ক্ষতি করে। আওয়াজ ও মেশিনের ঘড়ঘড়ানি থেকে দূরে থাকা উচিত।

iii) কানে ঠাণ্ডা লাগানো উচিত নয়। খুব বেশী ঠাণ্ডায় কান খোলা রাখলে বধিরতা পর্যন্ত ঘটতে পারে। পাহাড়ী এলাকায় বেড়াতে গেলে সবসময় কান ঢেকে রাখতে হবে।

iv) কিছু কিছু ওষুধ আছে যেগুলো এক অর্থে কানের পক্ষে ক্ষতিকর বিষ। অনেকদিন ধরে কিছু কিছু ওষুধ খেলে কানের ক্ষতি হয় এবং বধিরতার কারণ ঘটায়, ঝিমুনি আসে এবং কান কটকট করে। সুতরাং ডাক্তারের নির্দেশ ছাড়া কোনো ওষুধ খাওয়া উচিত নয়।

v) নোংরা নদী বা পুকুরে স্নান করা উচিত নয়।

vi) কানের মধ্যে নোংরা পিন বা কাঠি প্রবেশ করানো উচিত

নয়। কারণ এতে কানের ভেতরের নরম চামড়া ছড়ে যেতে পারে ও সেখানে জীবাণুর সংক্রমণ ঘটে কানে পুঁজের সৃষ্টি করতে পারে।

vii) নোংরা তেল বা অন্যান্য তরল যেমন নারকেল তেল, কর্পূর দেওয়া তেল, মাংসের রস, দেশী মদ ইত্যাদি টোটকা ওষুধ কানে ঢালা উচিত নয়, কারণ এতে কানের মধ্যে জীবাণুরা বাসা বাঁধে ও কানে পুঁজ সৃষ্টি হয়।

viii) হাইড্রোজেন পারক্সাইড দেখতে জলের মতো। এটা কানে ঢাললে ফেনা আকারে খোল বের হয়ে আসছে বলে মনে হলেও বাস্তবে তা হয় না। হাইড্রোজেন পারক্সাইড কানকে দুর্বল করে দেয়। এতে কান ভিজে ওঠে এবং তাতে জীবাণু জন্মে।

ix) চুলের খুসকিকে অবহেলা করা উচিত নয়। কারণ খুসকি কানের ভিতরে জীবাণুর বংশবৃদ্ধিতে সহায়তা করে ও তা থেকে কানে পুঁজ জন্মে।

x) ছোটদের দুধ খাওয়াবার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে তাদের কানের মধ্যে তা ঢুকে না যায়।

xi) সাধারণতঃ আমাদের কানের খইল পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয় না। তবে কানে খুব অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি করলে কানের মধ্যে লঘু গ্লিসারিণ কয়েকফোঁটা দেবার পর পরিষ্কার তুলোর তুলি দিয়ে কান পরিষ্কার করে নিতে হবে।

চোখের যত্ন কিভাবে নেওয়া যায়?

চোখের যত্ন নেবার জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

i) প্রতিদিন বারে বারে পরিষ্কার জল দিয়ে চোখে ঝাপটা দিতে হবে যাতে চোখ সবসময় পরিষ্কার থাকে, কিন্তু কখনই চোখ খুলে ঝাপটা দেবেন না। সবসময়ই চোখ বন্ধ করে চোখে জলের ঝাপটা দেবেন। প্রতি রাত্রে শোবার আগে ভালভাবে চোখ ধুয়ে নেওয়া উচিত।

ii) চোখ মোছার জন্যে সবসময়েই পরিষ্কার একটা নরম রুমাল

সঙ্গে রাখা উচিত। হাত মোছা রুমাল বা কাপড়ের খুঁট বা জামার হাতায় কখনও চোখ মোছা উচিত নয়। এতে চোখে যেকোন সময়েই সংক্রমণ ঘটতে পারে, ফলে কনজাঙ্কটিভাইটিস, ট্রকোমা ইত্যাদি রোগের সৃষ্টি হতে পারে।

iii) ছোটদের চোখে দেবার কাজল তৈরীর সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে ভূষোকালির সঙ্গে করকরে কিছু না থাকে ও তেলের মধ্যে বিষাক্ত কিছু না থাকে।

iv) প্রতিদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে চোখের কিছু ব্যায়াম করা উচিত। প্রথমেই সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকাতে হবে। তারপর অক্ষিগোলককে ঘুরিয়ে মাথা স্থির রেখে ডানদিকে তাকাতে হবে। তারপর নীচে তাকাবার পর তাকাতে হবে বাঁদিকে এবং পরিশেষে উপরদিকে। এইভাবে অক্ষিগোলককে ঘুরিয়ে চোখের ব্যায়াম করা উচিত প্রায় দশবার। এতে চোখের পেশীগুলোর কর্মক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

v) ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ খাবার খাওয়া উচিত। কারণ ভিটামিন-এ এর অভাব আমাদের চোখের অনেক ধরণের অসুখ সৃষ্টি করতে পারে ; যেমন—

vi) ডায়োরিয়ার ফলে চোখের ক্ষতি হয়। সুতরাং ডায়োরিয়া হলে তা যাতে তাড়াতাড়ি সারানো যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

vii) শিশুদের চোখের যত্ন নেওয়ার উদ্দেশ্যে ওদের মাতৃদুগ্ধ থেকে বঞ্চিত করা একেবারেই অনুচিত।

viii) একটানা অনেকক্ষণ পড়ার সময় মাঝে মাঝে চোখ বুজে চোখকে বিশ্রাম দেওয়া উচিত।

কতদূর থেকে পড়া উচিত ?

সাধারণতঃ দেড় ফুট দূরে বই রেখে পড়া উচিত।

আই. কিউ. কি ?

আই. কিউ. পুরো কথাটার অর্থ ইনটেলিজেন্স কোশেন্ট বা বুদ্ধ্যঙ্ক। সাধারণতঃ মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের অনুপাতকে ১০০ দ্বারা গুণ করে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাকেই বলে আই. কিউ।

$$\text{আই. কিউ.} = \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}} \times ১০০$$

ধরা যাক দুজন বালকের মানসিক বয়স আট বছর। যদি প্রথম জনের প্রকৃত বয়স বারো এবং দ্বিতীয় জনের প্রকৃত বয়স হয় ছয় বৎসর তবে এদের আই. কিউ. যথাক্রমে, 66·66 এবং 133·33 বছর।

বিভিন্ন স্তরের মানুষের আই. কিউ.-এর মান

শ্রেণী	বুদ্ধ্যঙ্ক
জড়ধী (Idiot)	20—25
মন্দধী (Imbecile)	26—50
স্বল্পবুদ্ধি (Moron)	50—70
প্রতিভাধর	110—120

গলার যত্ন কিভাবে নেওয়া উচিত ?

নিম্নোক্তভাবে গলার যত্ন নেওয়া উচিত :—

i) খাবার পর ভালভাবে গলা ধুয়ে ফেলা ভাল।

ii) খুব ঠাণ্ডা জিনিস খাবার পরই গরম খাবার খাওয়া ঠিক নয় কিংবা খুব গরমের পর ঠাণ্ডা খাবার খাওয়া ভাল না।

iii) অত্যধিক চিৎকারে গলা চিরে যায়। তাই অত্যধিক উত্তেজিত হয়ে চিৎকার না করাই উচিত।

iv) মাঝে মাঝে নুনজলের কুলি করা উচিত।

টিভির জন্য কি কি সাবধানতা নেওয়া উচিত।

সাধারণতঃ টিভি চলাকালীন টিভি থেকে এক ধরণের মৃদু এক্সরে উৎপন্ন হয়। ঐ এক্স-রশ্মি আমাদের চোখের পক্ষে ক্ষতিকর।

সেইজন্য টিভির সামনে একটি মোটা প্লাস্টিকের নীলবর্ণের স্ক্রীন লাগিয়ে নেওয়া উচিত। এতে দৃশ্যের প্রাখর্য্য কমে যায় ও ঐ স্ক্রীন মৃদু এক্সরেকে শোষণ করে নেয়। এছাড়া টিভির ঔজ্জ্বল্য চোখের ক্ষতি করতে পারে বলে টিভির ঠিক মাথার ওপর একটা হাই-পাওয়ারের (40 বা 60W) বাল্ব লাগানো উচিত ও যতক্ষণ টিভি দেখা হচ্ছে বাল্বটা ততক্ষণ জ্বালিয়ে রাখা উচিত। অন্ধকার ঘরে একেবারেই টিভি দেখা উচিত নয়। মনে রাখা ভাল যে টিভির জন্যে হাজারো প্রতিরক্ষা নেওয়া সত্বেও দেখা গেছে যে এক্সরে নির্গমন হয়ই। সেইজন্যে সর্বদাই টিভি থেকে 8—10 ফুট দূরে বসতে নির্দেশ দেন বিজ্ঞানীরা। টিভির কাছে বসে টিভি দেখার জন্য গর্ভবতী মায়েদের বা তাঁদের শিশুর নানা রোগ হতে দেখা গেছে। এছাড়া টিভি খুব কাছ থেকে বেশীদিন দেখলে চোখেরও ক্ষতি হয়, ঐ এক্সরে চোখে আসার জন্য। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা প্রয়োজন যে এক্সরে ক্যানসার রোগ সৃষ্টির এক প্রধান কারণ।

খাবারের সংস্কার ও সংশয়, খাদ্য সম্বন্ধে সবচাইতে আগে কি জানা উচিত ?

জীবন-ধারণের জন্যে প্রয়োজনীয় সর্তগুলির অন্যতম উপাদানই হল খাদ্য। খাদ্য ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না। তাই সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত দিনের একটা বিরাট অংশই আমরা ব্যয় করি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে খাদ্য সংগ্রহের জন্য। কেবলমাত্র সবুজ উদ্ভিদ ও কয়েক প্রকার ব্যাকটেরিয়া নিজেরাই নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করতে সক্ষম। সবুজ উদ্ভিদ মাটি থেকে সংগৃহীত জল, খনিজ লবণ ও বায়ু থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইডের সাহায্যে নিজেদের খাদ্য তৈরী করে। প্রাণিকুল প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে খাদ্যের জন্য তাই উদ্ভিদের ওপরেই নির্ভরশীল।

মানুষ বা প্রাণীর খাদ্য নির্বাচন কিন্তু সম্পূর্ণভাবেই নিজেদের ওপর নির্ভরশীল নয়, কিছুটা প্রভাবিত হয় প্রাকৃতিক নির্বাচনের দ্বারা।

যেমন গরু বা অন্যান্য ঐ জাতীয় প্রাণী ঘাসপাতা কাঁচা খেয়ে হজম করতে পারে; কারণ তাদের পাচন রসে বিশ্লেষণকারী এনজাইম নামে বিশেষ ধরণের এনজাইম থাকে। তেমনি মানুষের খাবারও পরিবেশ, দেহের গঠন ও স্বাস্থ্য অনুসারে ও কার্যক্ষমতা অনুসারে বিভিন্ন ধরণের হয়। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে মানুষের খাদ্য নীতি বিভিন্ন ধরণের হয়।

আমরা যে খাদ্যদ্রব্য ব্যবহার করি সেগুলোকে দুভাগে ভাগ করা যায়—i) দেহ পরিপোষক খাদ্য,

ii) দেহ সংরক্ষক খাদ্য।

দেহ পরিপোষক খাদ্য কি?

যে সকল খাদ্য বস্তুতে কার্বোহাইড্রেট বা শর্করাজাতীয় খাদ্য, প্রোটিন ও ফ্যাট বা তৈলজাতীয় খাদ্যবস্তু বর্তমান তাকেই বলে দেহ পরিপোষক খাদ্য। অর্থাৎ দেহপরিপোষক খাদ্য তিন ধরণের উপাদান নিয়ে গঠিত : ১) শর্করা জাতীয় খাদ্য,

২) প্রোটিন জাতীয় খাদ্য

৩) তৈল বা চর্বিজাতীয় খাদ্য।

দেহ সংরক্ষক খাদ্য কি?

দেহ সংরক্ষক খাদ্য তিন ধরণের খাদ্যবস্তুর সমন্বয়ে গঠিত ;

১) ভিটামিন, ২) খনিজ লবণ, ৩) জল।

আমরা কোন কোন খাবার থেকে কোন কোন ধরণের খাদ্যবস্তু পাই তা নিয়ে নানা সংশয়। নিম্নে ছকের আকারে এর তালিকা দেওয়া হল :—

খাদ্য	কাজ	কিসে পাওয়া যায়
১) প্রোটিন	দেহগঠন করা অর্থাৎ দেহের কোষ, পেশী ও রক্ত প্রভৃতি দেহরস তৈরী ও পূরণ করে	দুধ, ডিম, মাংস, মাছ, বাদাম, সোয়াবিন, শিম,

খাদ্য	কাজ	কিসে পাওয়া যায়
	এবং সংক্রমণ প্রতিরোধের উপযোগী এনজাইম এণ্টিবডি তৈরীতে সাহায্য করে।	কড়াই, মটর, ছোলা, ডাল, চাল, গম, যকৃৎ ইত্যাদি।
২) শর্করা	দেহকে শক্তি দেওয়া।	ভাত, গমের রুটি, আলু, সাগু, বার্লি, ওল, পিঁয়াজ, মূল ও কন্দ জাতীয় অন্যান্য সব্জী, চিনি, গুড় ইত্যাদি।
৩) ফ্যাট	দেহকে শক্তি দেওয়া।	দুধ, ঘি, মাখন, পনীর, বনস্পতি, তেল, বাদাম, অন্যান্য তৈলবীজ, সর্ষে, তিল, কডলিভার অয়েল, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।
৪) ভিটামিন-A	গায়ের চামড়া ও শ্লেষ্মা-ঝিল্লী সুস্থ রাখা ও রাতকানা রোগ থেকে রক্ষা করা।	মাছের যকৃতের তেল, দুধ, দই, মাখন, ঘি, গাজর, পাকা ফল, সবুজ শাক ও হলদে রঙের ফল, টম্যাটো ইত্যাদি।
৫) ভিটামিন-B (থিয়ামিন)	স্বাভাবিক ক্ষুধা পাওয়ায়, পাচনে সাহায্য করে। নার্ভতন্ত্রকে সুস্থ রাখে ও শর্করা উপাদানকে কাজ করতে সাহায্য করে।	লিভার, ডিম, শিম, বরবটি, সোয়াবিন, ঈষ্ট, সেদ্ধ চাল, দানা শস্য ইত্যাদি।

খাদ্য	কাজ	কিসে পাওয়া যায়
৭) ভিটামিন-B_2 (রাইরো-ফ্লেভিন)	দেহ কোষকে অক্সিজেন ব্যবহারে সাহায্য করা, দৃষ্টি-শক্তি স্বচ্ছ রাখা, নাক ঠোঁটের চারধারে চামড়া ওঠা কিংবা ঠোঁটের কোণ ফাটা প্রতিরোধ করা।	দুধ, মাঠাতোলা দুধ, দই, পনীর, ডিম, লিভার এবং সবুজ শাকপাতা।
৭) নিযাসিন	স্বাস্থ্যকর চর্ম এবং পাকযন্ত্র, অন্ত্র ও নার্ভতন্ত্রের কাজ ঠিক ভাবে চালানো।	ভাত, খিচুড়ি, ডাল, মাংস, ঈষ্ট, বাদাম, তিল ইত্যাদি।
৮) লাইপোইক অ্যাসিড	শ্বসন কার্যে বিশেষ সহায়তা করে। (পাইরুভিক অ্যাসিড ও X কিটোগ্লুটারিক অ্যাসিডের অপ্রিডেটিভ কার্যোপ্রাই লেশনে সাহায্য করে।)	সবুজ শাকপাতা, ডিম, মাংস ইত্যাদি।
৯) ভিটামিন-B_3 (প্যাসটোথেনিক অ্যাসিড)	বিপাক ক্রিয়ায় Co-enzyme-A হিসাবে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা নেয় এবং এর কিছু যৌগ হিমোগ্লোবিন সংশ্লেষণে অংশ নেয়।	লিভার, ডিম, মাংস, দুধ, ইষ্ট, গুড়, গম, বার্লি, মটর, আলু ইত্যাদি।
১০) ভিটামিন-B_6 (পাইরিডস্ক্সিন)	বিপাক ক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়। (ট্রিপটোফ্যান এর বিপাক ঘটাতে সাহায্য করে।)	সবুজ শাকপাতা, বীজ, মটর, বাদাম, লিভার, ডিমের কুসুম, মাংস, ঈষ্ট ইত্যাদি।

খাদ্য	কাজ	কিসে পাওয়া যায়
১৫) ভিটামিন-E (টোকোফেরল)	শ্বসনতন্ত্রের শ্বসনের সহযোগী সাইটোক্রোম a ও b-এর মধ্যে ইলেকট্রন পরিবহনে সাহায্য করে ও জনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। গর্ভস্থ ভ্রূণের বৃদ্ধি ও পরিপোষণে Vit.-E-এর গুরুত্ব অপরিসীম।	ডিম, দুধ, মাছ, মাংস, বাদাম, গম, সোয়াবিন ইত্যাদি।
১৬) ভিটামিন-K (ফাইলো-কুইনোন)	রক্ততঞ্চনে সাহায্য করে। এছাড়া মাইটোকনড্রিয়ার মধ্যে শ্বসনকালে অপ্রিডেটিভ ফসফোরাইলেশান প্লাটী-নোয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেয়।	বাঁধাকপি, নাস-পাতি, টম্যাটো, সোয়াবিন, ডিম ইত্যাদি।
১৭) ক্যালসিয়াম	হাড় ও দাঁতের প্রধান উপাদান। রক্ততঞ্চনে গুরুত্ব-পূর্ণ অংশ নেয়।	দুধ, দই, মাখন, ছানা, সবুজ শাক পাতা, ছোট ছোট কাঁটা মাছ, ভাত, ডাল, তিল, বাদাম, ইত্যাদি।
১৮) ফসফোরাস	পেশী ও নার্ভের স্বাভাবিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সাহায্য করে। আমাদের খাদ্য নালীর সংকোচন ও প্রসারণে (পেরিস্টলসিন) সাহায্য করে।	দুধ, দই, মাখন, ছোট মাছ, ডিম, দুধ, বাদাম ইত্যাদি।

খাদ্য	কাজ	কিসে পাওয়া যায়
১১) ফোলিক অ্যাসিড	DNA সংশ্লেষণের জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয় পদার্থ। এটা অবশ্য অন্যান্য নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণেও অংশ নেয়।	লিভার, বাদাম, সবুজ শাকপাতা ইত্যাদি।
১২) ভিটামিন-B_{12} (সায়ানোকোবালামিন)	এটা চর্মরোগ প্রতিষেধক ও পারমিসিয়াম অ্যানিমিয়া নামক ভয়াবহ রক্তাল্পতার হাত থেকে রক্ষা করে। এই ভিটামিন লৌহের পাচন ও শোষণ বাড়িয়ে দেয়।	লিভার, ডিম, দুধ, গরুর মাংস ইত্যাদি।
১৩) ভিটামিন-C (অ্যাসকরবিক অ্যাসিড)	দেহ কোষগুলিকে সংযুক্ত রাখা, রক্তবাহী নালিকাগুলির গাত্রপৃষ্ঠ সুদৃঢ় করা, সংক্রমণ প্রতিরোধের শক্তি দেওয়া ও ব্যাধি নিরাময়ে সাহায্য করা।	আমলকী, পেয়ারা, কমলা লেবু, পাতিলেবু, মৌসামী লেবু, তাজা ও সবুজ শাকসব্জী এবং অঙ্কুর বেরনো ডাল, ছোলা নতুন আলু, আম ইত্যাদি।
১৪) ভিটামিন-D (ক্যালসিফেরল)	শরীরকে ক্যালসিয়াম গ্রহণে সাহায্য করে এবং সুদৃঢ় দাঁত ও হাড় গঠনে সাহায্য করে। ফসফরাসের শোষণেও ইহা সাহায্য করে।	মাখন, পনীর কডলিভার অয়েল, ঘি, ডিমের কুসুম, দুধ ইত্যাদি। ত্বকে সূর্যালোক পড়লে ত্বকের মধ্যে ভিটামিন-D তৈরী হয়।

খাদ্য	কাজ	কিসে পাওয়া যায়
১৯) লৌহ	হিমোগ্লোবিন তৈরীর জন্য প্রোটিনের সঙ্গে প্রয়োজন হয়। হিমোগ্লোবিন হলো রক্তের লাল কণিকা যা কোষে অক্সিজেন পৌঁছে দেয় ও কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে আনে।	লিভার, ঈষ্ট, ডিম সবুজ শাকসব্জী, তৈলবীজ, বাদাম, শিম, ডাল, গুড়, মেওয়াফল ইত্যাদি।

আমাদের আরও অনেক ধরণের ভিটামিন ও খনিজ লবণের প্রয়োজন হয়। এনিয়েও নানা সংশয়। তবে এতে শুধু অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যবস্তুরই বর্ণনা দেওয়া হল। নিম্নে এই সকল খাদ্যবস্তু কি পরিমাণে খাওয়া প্রয়োজন তা দেওয়া হল :—

খাদ্য	পরিমাণ
প্রোটিন	70 gm.
ফ্যাট	50 gm.
শর্করা	440 gm.
ক্যালসিয়াম	0·8 gm.
ফসফোরাস	1·4 gm.
লৌহ	40 mgm.
ভিটামিন-A	7300 i. u. (International unit)
ভিটামিন-B_1	1·8 mgm.
ভিটামিন-C	200 mgm.

স্নেহজাতীয় পদার্থে ভেজাল আছে কি নেই ?

তেল, ঘি প্রভৃতি স্নেহজাতীয় পদার্থ আমাদের দৈনন্দিন খাদ্যে একটা বিশেষ স্থান অধিকার করে। বিশেষভাবে সরষের তেল আমাদের বাঙালীর ঘরে নিত্যপ্রয়োজনীয় অত্যাবশ্যক দ্রব্যবিশেষ। আজকাল দেশের অবস্থা এমনই যে বাজারে খাঁটি সরষের তেল পাওয়া

এক ভাগ্যের ব্যাপার। সরষের তেলে সাধারণতঃ শিয়ালকাঁটা, তিসির তেল, মেটে তেল, মহুয়া বীজের তেল ইত্যাদি মেশানো হয়ে থাকে। সরষের তেলের ঝাঁঝ ও গন্ধ বজায় রাখাবার জন্য এতে মূলোর বীজ, লঙ্কার গুঁড়ো ও কৃত্রিম গন্ধ ব্যবহার করা হয়। ভেজাল মেশানোর জন্য তৈল জাতীয় পদার্থের ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের যে পরিবর্তন ঘটে সেই পরিবর্তন রিফ্র্যাক্টোমিটার নামে যন্ত্রে ধরা পড়ে। অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভেজাল মেশানো সত্বেও ঘনত্ব ও আপেক্ষিক গুরুত্বের পরিবর্তন ঘটে না।

দুধে ভেজাল আছে কি নেই!

দুধে প্রধান ভেজাল জল। দুধে জলের ভেজাল দিলে ল্যাক্টোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে তা খুব সহজেই ধরে ফেলা চলে। দুধে জল মেশালে দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব কমে যায়। অনেক সময় ভেজালকারীরা দুধে জল মেশালে জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব ও দুধের আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিক রাখার জন্য ওতে বাতাসা গুলে মিশিয়ে দেয়। ফলে ল্যাক্টোমিটার যন্ত্রে আপেক্ষিক গুরুত্ব ঠিকভাবে পরিমাপ করা যায় না। জলের আপোক্ষক গুরুত্ব বাড়াবার জন্য খড়ির গুঁড়ো, সস্তা গুঁড়ো দুধ, বার্লি, এরারুট, শটির পালো প্রভৃতিও মেশানো হয়ে থাকে। কখনও কখনও আবার গরুর দুধের সঙ্গে মহিষের দুধ মিশিয়েও দুধে ভেজাল দেওয়া হয়।

চাল, ডাল, প্রভৃতি শুকনো খাদ্যে ভেজাল আছে কি নেই!

চাল, ডাল, চিনি, ঘি, নুন প্রভৃতি শুক্‌নো খাদ্যবস্তুতে নানারকম ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে। চালের প্রধান ভেজাল কাঁকর। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে খুদ, পচা বা গুঁমো চাল, কুঁড়ো, ধান, তূষ প্রভৃতি মিশিয়েও চালে ভেজাল দিতে দেখা যায়। আটা-ময়দায় বড়ির গুঁড়ো, চিনেমাটির গুঁড়ো, তেঁতুল বীজের গুঁড়ো প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়। চিনিতে রামখড়ির গুঁড়ো, সাদা বালি প্রভৃতি ভেজাল দেওয়া হয়ে থাকে। ডাল, গম প্রভৃতিতে নানা প্রকার দানা, পাথর কুচি,

মাটির ছোট ছোট ঢেলা প্রভৃতি মেশানো হয়। আটা ময়দায় ভেজাল সাধারণভাবে ধরা খুব কঠিন। তবে আটা বা ময়দায় জল মিশিয়ে ডেলা করলে এর ভেজাল পরিষ্কারভাবে বোঝা যায়। অন্যান্য বাজে জিনিষের ভেজাল যেমন পাথর কাঁকর প্রভৃতি চোখে দেখেই বুঝতে পারা যায়। কিন্তু কিছু জিনিসের ভেজাল ধরা খুব কঠিন।

কোন শব্দ খারাপ!

শব্দ-দূষণ এযুগের এক গুরুতর সমস্যা। শহর অঞ্চলের শব্দ-দূষণের মূল উৎসগুলো হল মোটর গাড়ীর হর্ণ, বাজি-পটকার আওয়াজ, রেডিও-টেলিভিশনের আওয়াজ, মাইকের অত্যাচার এবং কলকারখানার শব্দ। শব্দ দূষণের পরিণাম শ্রবণেন্দ্রিয় অকেজো হয়ে যাওয়া, স্নায়ুতন্ত্রের ওপর চাপ পড়া, হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়া এবং নানা রকম স্নায়ুরোগের সৃষ্টি হওয়া। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিকেল রিসার্চের এক সমীক্ষায় জানা যায়—আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী শব্দের পরিমাপ হওয়া উচিত ৩৫ ডেসিবেল থেকে ৪৫ ডেসিবেল। কিন্তু কলকাতায় শব্দের পরিমাপ ৬০ ডেসিবেল থেকে ৬৫ ডেসিবেল এবং এমনকি কোথাও কোথাও ৮০ ডেসিবেল পর্যন্ত। কারখানার শব্দের পরিমাপ হওয়া উচিত ৮৫ ডেসিবেল-এর মধ্যে। কিন্তু আমাদের কলকারখানায় যে শব্দ হয় তার পরিমাপ ১২০ ডেসিবেল-এর ও বেশী। এজন্য দেখা গেছে এদেশের কোন কোন কারখানার আশপাশের স্থায়ী বাসিন্দাদের ৬০ শতাংশই কম-বেশী বধির।

গঙ্গা দূষণ কিসে হয়!

গঙ্গা হিন্দুদের অতি পবিত্র নদী। হিন্দুদের বিশ্বাস গঙ্গা পাপহারিণী ত্রিতাপনাশিনী। সেই গঙ্গার পবিত্রতা আজ বিপন্ন। গঙ্গা হিমালয়ের গঙ্গোত্রি হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হয়ে নিচে নামার

সময় আরোও ছোটনদী মূল নদীরসঙ্গে মিশে এর জলকে ঘোলা করে। কুম্ভমেলায় লক্ষ লক্ষ লোক গঙ্গার জলে স্নান করে এঁর জলকে নোংরা করে। গঙ্গাতীরে গড়ে ওঠা ১৩২ টা কারখানা গঙ্গাকে তাদের নর্দমা হিসেবে ব্যবহার কোরে, গঙ্গার জলে বিষ ঢেলে চলেছে। শুধুমাত্র বারানসীতে প্রতি বছর প্রায় ৩,০০০ অর্ধদগ্ধ মৃতদেহ ভাসিয়ে দেওয়া হয় গঙ্গার জলে। তাছাড়া পাটনা, মুঙ্গের, ভাগলপুর, ছাপরা প্রভৃতি জায়গায় গঙ্গা নানাভাবে দূষিত হচ্ছে। সারা ভারতের যে ১৩২ টা কারখানা গঙ্গার জলে বিষ ঢালছে তার মধ্যে ৮৬ টা কারখানাই উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত। এই ১৩২ টা করখানার অর্ধেক শুধুমাত্র কানপুরে। এখানে ১৩টা বড় নালা দিয়ে মানুষের প্রাতঃকৃত্যজনিত আবর্জনা এবং ট্যানারি নিস্থত বিষাক্ত পদার্থ সোজা গিয়ে গঙ্গায় পড়ছে। কলকাতায় হুগলি নদীর দুতীরে অবস্থিত কলকারখানাগুলো থেকেও তাদের বর্জ্যপদার্থ ও মারাত্মক কেমিক্যালস খোলা নর্দমা দিয়ে সরাসরি গঙ্গায় গিয়ে পড়ে। এখানে গঙ্গার জল এমন নোংরা যে তা ব্যবহারের অযোগ্য। এমনকি গঙ্গার জলে স্নান পর্যন্ত করা চলে না। কিন্তু আশ্চর্য্যের ব্যাপার এই যে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের পানীয় জলের অন্যতম প্রধান উৎস হল গঙ্গার জল। গঙ্গাদূষণ রোধ করার জন্য গঙ্গা অ্যাকসান প্ল্যান্ট তৈরী হয়। এই প্ল্যান্ট তৈরীর এক বছর পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু গঙ্গাদূষণ রোধের কাজ সেই তুলনায় কিছুই এগোয়নি।

কাটা ফল কেন খাব না !

রাস্তাতে আমরা হামেসাই কাটা ফল বিক্রি করতে দেখতে পাই। আমরা বাজার থেকে যে ফল কিনে নিয়ে আসি আর রাস্তার ধারে কাটাফল বিক্রেতারাও বাজার থেকে ওই একই ফল কিনে নিয়ে আসে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আমাদের থেকে অনেক কম দামে

নিকৃষ্টমানের ফল কিনে নিয়ে আসে। কিন্তু আমাদের কাটা ফলের থেকে ওদের ফলের রং অনেক ভাল ও মিষ্টি বেশি।

কারণ ওরা বাজার থেকে এক প্রকার সস্তায় রং কিনে আনে। এই রং গুলে স্যাকারিন মিশিয়ে কাটা ফল ডুবিয়ে রেখে দেয়। যে সব রং বিক্রেতারা কাটা ফলে ব্যবহার করে সেই সব রং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই কারণে রাস্তায় কাটা ফল কিনে খাওয়া উচিৎ নয়।

চিনি ভাল না গুড় ভাল!

আমরা অনেকেই (সংসারে প্রায় সবাই) চিনি ও গুড় দুটোই ব্যবহার করি। কিন্তু জানিনা কোনটা বেশী উপকারি।

চিনি তৈরী হয় আখের রস থেকে আর গুড় তৈরী হয় সাধারণতঃ আখের রস বা খেজুর রস জ্বাল দিয়ে।

চিনিতে থাকে সুক্রোজ নামে শর্করা। গুড়েতেও তা থাকে, কিন্তু তার সঙ্গে কিছু ধাতব উপাদান ও সামান্য প্রোটিন পাওয়া যায়।

অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে চিনির চেয়ে গুড় ভাল।

কীটনাশক ব্যবহারকারী শস্য কি খাওয়া উচিত?

আজকাল বিভিন্ন শস্যকে পোকামাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন প্রকার কীটনাশক ব্যবহার করা হয়।

জৈব কীটনাশক সাধারণতঃ ক্লোরিন, ফসফরাস ও কার্বনেট যুক্ত হয়।

এর মধ্যে ক্লোরিন যুক্ত জৈব যৌগগুলি চর্বিতে দ্রবণীয়। এরা দেহের চর্বিতে অতি সহজেই দ্রবীভূত হয় এবং মেটাল নার্ভাস সিস্টেমকে বিপর্যস্ত করে। ফসফরাসও কার্বনেট যুক্ত যৌগ শরীরে প্রবেশ করে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি করে।

তবে শস্যের উপর যে কীটনাশক ব্যবহার করা হয় তাতে ভয় পাবার কিছু নেই। প্রত্যেকটা কীটনাশক দ্রব্যের একটা

যোগ্যমাত্রা আছে। সেই পরিমাণ শরীরে প্রবেশ করলে কোন ক্ষতি হয় না। কিন্তু বাস্তবে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ কীটনাশক শস্যে ব্যবহার করা হয়। এই কারণে কীটনাশক ব্যবহার করা শস্য একুশ দিন পর ব্যবহার করলে কীটনাশকের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়ে যায়, তাছাড়া কীটনাশক ঔষধ সাধারণ শস্যের উপরেই থাকে। ফলে কীটনাশক ঔষধ ব্যবহার করা শস্য একুশ দিন পর ভালভাবে ধুয়ে ব্যবহার করলে আর কোন ভয় থাকে না।

প্লাস্টিকের ঠোঙ্গায় কি খাওয়া উচিত?

বর্তমান যুগে প্রায় সব কিছুতেই প্লাস্টিকের ব্যবহার হচ্ছে। বর্তমানে আবার প্লাস্টিকের প্যাকেটে করে খাবার বিক্রি হয়। অনেকের ধারণা খাদ্য-দ্রব্য সংরক্ষণে প্লাস্টিকের ব্যবহার স্বাস্থ্য-সম্মত নয়।

খাবার দাবার রাখার জন্য আমরা যে প্লাস্টিক ব্যবহার করি পলিথিন বা পলিপ্রোপিলিন হল তার রাসায়নিক নাম। এই ধরণের প্লাসটিক রাসায়নিক দিকে একেবারে নিষ্ক্রিয়। এই ধরণের প্লাস্টিক শরীরের কোন ক্ষতি করে না।

পলিথিন এবং পলিপ্রোপিলিন ছাড়া প্লাস্টিক আরও অনেক জাতের হয়। পি. ভি. সি. হল এরূপ একটি প্লাস্টিক যার পুরো নাম পলি-ভিনাইল-ক্লোরাইড। এই পি. ভি. সি. তৈরী করার সময়ে প্ল্যাসটিসাইজার যোগ করা হয়। এই প্ল্যাসটিসাইজার শরীরের পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকর।

তবে দুধ বা শুকনো খাবার সংরক্ষণের জন্য যে স্বচ্ছ প্লাসটিক ব্যবহার করা হয় তাতে প্লাসটিসাইজার থাকে না। ফলে এই সব খাবারের প্লাসটিকের প্যাকেটগুলো স্বাস্থ্যের কোন ক্ষতি করেনা।

রং মাখা সবজি কি খাওয়া অনুচিত?

বর্তমানে শহরের যে কোন বাজারে বাসি ফ্যাকাসে সবজিকে রং মাখিয়ে বিক্রি করা হয়।

যে সব সবজির রং সবুজ সাধারণত সেগুলোতে রং মেশাতে হয়। সস্তায় কপার সালফেট ক্ষারকীয় রং বা বেসিক রং কিনে এক বাক্স জলে ঐ রং গুলে সবজিগুলো দশ মিনিট ভিজিয়ে রাখলে সবজিগুলোর গায়ে সবুজ রং আঠার মত আটকে যায়। এই রং যদি শরীরের মধ্যে যায় তাহলে শরীরের ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে বেশী। তবে যে সব রং মাখান সবজির বাইরের অংশ বাদ দিতে হয় সেইসব সবজিতে ভয় থাকে না।

বাজার থেকে সবজি কেনবার সময় সবজির বোঁটার দিকে যদি তাকাই তাহলে বুঝতে পারা যাবে সবজিটা রং মাখান কিনা। যদি বোঁটার গায়ে সবুজ রং লেগে থাকে এবং একটু খোটা দিলে রং উঠে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে সবজিটা রং মাখান।

অসুস্থ মায়ের দুধ কি শিশু খাবে!

আমাদের অনেকেরই ধারণা অসুস্থ মায়ের দুধ নবজাত শিশুর খাওয়া উচিত নয়। কিন্তু আমরা এটাও জানি যে মায়ের দুধের বিকল্প নেই। এজন্য মায়ের কোন অসুখ করলে নবজাত শিশুর মার বুকের দুধ খাবে কি না সেটা একটু চিন্তা করা উচিত।

অভিজ্ঞ ডাক্তাররা বলে থাকেন অসুখ বাদে অন্য কোন অসুখ হলে মার বুকের দুধ শিশুদের খেতে কোন বারণ নেই।

যে মা ভাইরাল হেপাটাইটিসে ভুগছেন তার বুকের দুধের মাধ্যমে বাচ্চার শরীরে রোগ ছড়াতে পারে। অতএব এক্ষেত্রে ঐ রোগে আক্রান্ত মার বুকের দুধ বাচ্চার খাওয়া বারণ। আরও কিছু রোগ আছে যেমন ক্যানসার, যক্ষ্মা এইরকম কয়েকটি রোগ। আবার যক্ষ্মা রোগের চিকিৎসাধীনে আছেন মা, তখন বাচ্চাকে তার দুধ খাওয়ান উচিত নয়। আবার মা যখন অপুষ্টি রোগে ভোগেন তখন ঐ মার বুকের দুধ বাচ্চাকে দেওয়া উচিত নয়।

সব লজেন্স কি খাওয়া উচিত!

বড় বড় দামী কোম্পানিগুলোর কথা এখানে আসে না কিন্তু

ছোট ছোট কোম্পানী যারা লজেন্সের কারবার করে তাদের উৎসাহ অফুরন্ত।

এই ছোট ছোট কোম্পানির লজেন্সে যে রং ব্যবহৃত করা হয় তা কিন্তু সরকার-অনুমোদিত নয়। এ সব রং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। আবার মিষ্টির দোকানে জিলিপি, বোঁদে, রাজভোগ, কালোজাম এই সব মিষ্টিতে যে সব বং ব্যবহার করা হয় সে সব রং সরকারের অনুমোদিত নয়। এই সব রং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক।

পথে সরবৎ খাওয়া কি অনুচিত!

গরমের দিনে রাস্তায় নানা রঙের সরবৎ বিক্রি করতে দেখা যায়। তেষ্টায় যখন মানুষের মাথার চাঁদি ফেটে যাবার উপক্রম হয় তখন এই রং বেরঙের সরবৎ খেতে ছোটে।

কিন্তু এই সরবৎ কি খাওয়া উচিত? এই সরবৎ কখনই খাওয়া উচিত নয় কারণ খোলা জায়গায় আঢাকা অবস্থায় ধূলো-ময়লা ভরা পরিবেশের মধ্যে এই সরবৎ তৈরী করা হয়। আবার এই সরবৎ-এ যে সব রঙ্গীন জল ব্যবহার করা হয় সেইসব রঙ্গীন জল সরকার অনুমোদিত নয়। এই রং শরীরের ক্ষতি করে। অর্থাৎ পথে এই ধরণের সরবৎ খাওয়া মানে জেনেশুনে বিষ পান করা ছাড়া আর কিছুই নয়।

একই তেলে কি বারবার ভাজা ভাল নয়!

বেশীর ভাগ বাড়ীতে দেখা যায় যে তেলে একটা জিনিষ রান্না হল ঠিক সেই তেলে আরেকটা জিনিস রান্না হচ্ছে। এই যে একই তেলে বারবার ভাজা হচ্ছে সেটা কি ভাল না খারাপ?

একই তেল বারবার উত্তপ্ত করলে সেই তেল থেকে এমন কয়েকটি জিনিষ বের হয় যা শরীরের পক্ষে রীতিমত ক্ষতিকর। একই তেল বারবার গরম করলে তেল তাপ-বৈশিষ্ট্য হারায় এবং নিজের চরিত্র বদলায়। এর ফলে একই তেলে বারবার রান্না না করাই ভাল।

কাঁসার পাত্রে টক খেতে নেই কেন ?

বাড়ীর বড়রা কখনো কাঁসার পাত্রে টক খেতে দেয় না। যদিও ভুল করে কাঁসার পাত্রে টক দিয়ে দেয় তাহলে তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলেন, নাহলে টক নষ্ট হয়ে যাবে বলেন।

কাঁসার পাত্রের একটি উপাদান হল তামা। অর্থাৎ কাঁসাতে তামা পাওয়া যায়। আর টক মাত্রই অ্যাসিড। এই অ্যাসিড তামার সঙ্গে বিক্রিয়া করে কপার সালফেট নামে একপ্রকার যৌগ গঠন করে। এই যৌগ শরীরের পক্ষে ভাল নয়। এই যৌগ আমাদের শরীরে বিষক্রিয়া করে। আবার কাঁসার পাত্রে দই রাখা যায় না, কারণ দই-এ ল্যাকটিক অ্যাসিড পাওয়া যায়।

মাংসে পেঁপে-কি হজমে সাহায্য করে ?

বাড়ীতে মা মাসীরা মাংসকে সহজ আর ঘরোয়াভাবে রান্না করার জন্য অনেক সময়ে মাংসে পেঁপের টুকরো দিয়ে থাকেন।

এর কারণ পেঁপের মধ্যে যে আঠা বর্তমান তাতে থাকে প্যাপেন। প্যাপেন একটা উৎসেচক। এটা প্রোটিনকে ভেঙে দিতে পারে। ফলে প্রোটিন-জাতীয় খাদ্যবস্তুকে সহজে হজম করাতে এ সাহায্য করে। পেঁপের মত আর একটা ফলের নাম করা যেতে পারে। তার নাম আনারস। পেঁপের প্যাপেনের মত আনারসে ব্রোমেলিন থাকার জন্য মাছ মাংস খাওয়ার পরে কেউ যদি কাঁচা আনারস খায় তবে তা হজমে সাহায্য করবে।

খেসারির ডাল কি খাওয়া উচিত ?

খেসারির ডালে থাকে বিটা এন নিকসালিল আলফা বিটা ডায়ামিনো প্রোপায়োনিক এসিড। এটা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই কারণে খেসারির ডাল খাওয়া উচিত নয়।

ছাতাপড়া বাদাম কি খাওয়া উচিত ?

বাদামে যে ছাতা পড়ে তা থেকে এক ধরণের বিষাক্ত পদার্থ

তৈরী হয় তার নাম আফলা টকসিন এম। এই বিষাক্ত পদার্থ শরীরে প্রবেশ করলে লিভারে ক্যান্সার এবং অন্যান্য দুরারোগ্য ব্যাধিতে মৃত্যু ঘটতে পারে।

অতএব ছাতাপড়া বাদাম খাওয়া উচিত নয়।

ঝাল কতটা নির্ভাবনায় খাওয়া যেতে পারে ?

বাজারে যে শুকনো লঙ্কা পাওয়া যায় তার রং ফ্যাকাসে। এই ফ্যাকাসে রংকে গাঢ় ও চকচকে লাল করার জন্য সুদান-৪ ব্যবহার করা হয়। এই সুদান-৪ বা এই জাতীয় তেলে দ্রবণীয় রং স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এবং ক্যান্সার হওয়ার সম্ভবনা আছে। আবার বাজারে যে গুঁড়া লঙ্কা পাওয়া যায় তাতে ধুলা-বালি, স্টার্চ, ইত্যাদি এমন সব উপাদান মেশান হয় যা ক্ষতিকর। অতএব দোকান থেকে রং করা শুকনো লঙ্কা এবং গুঁড়ো লঙ্কা খাওয়া উচিত নয়।

চা খাব না কফি খাব !

চা এবং কফি উভয়েরই কাজ হল স্নায়ুকে উত্তেজিত করা এবং এই কাজটা করে ক্যাফিন নামক একপ্রকার উপক্ষার যার উপস্থিতি শতকরা হিসাবে চায়ে বেশী। এছাড়া চায়ে ফ্যাটিচিন নামে এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া যায় যা শরীরের পক্ষে উপকারী। এই ফ্যাটিচিন কফিতে পাওয়া যায় না।

তাই কফি পান করার চেয়ে চা পান করা ভাল।

লাল রাঙালু খাওয়া উচিত না অনুচিত ?

আমরা বাজারে যে লাল টকটকে রাঙালু দেখতে পাই তার রং অনেকটা ফ্যাকাসে। রাঙালুর গায়ে বিষাক্ত বরাভাসিন-বি লাল রং করা হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই কারণে লাল রাঙালু খাওয়া উচিত নয়।

হাঁসের ডিম না মুরগির ডিম খাব !

খাদ্য বিজ্ঞানীরা বলেন হাঁসের এবং মুরগির ডিমের খাদ্য মূল্য এক। অর্থাৎ একই ওজনের একটি হাঁসের ও একটি মুরগির ডিমে একই উপাদান থাকে। তবে বাজারে দুটো ডিমের মধ্যে যার ওজন বেশী সেটা গ্রহণ করাই ভাল।

সেদ্ধ চাল না আতপ চাল খাওয়া উচিত ?

সেদ্ধ চালের ভিটামিন এবং ধাতব উপাদানগুলি ধানকে বাষ্পে সেদ্ধ করার সময় ধানের তণ্ডুল কণার ভেতরের দিকে চলে যায় কিন্তু আতপ চালের সেই সুযোগ নেই।

ফলে কলে ছাঁটাইয়ের সময় সেদ্ধ চালের পুষ্টিকারিতা অনেকটা বজায় থাকে যেটা আতপ চালে রাখা কঠিন।

এই কারণে আতপ চালের থেকে সেদ্ধ চাল খাওয়া ভাল।

ভেজান ছোলা যেখানে সেখানে কি খাওয়া উচিত ?

রাস্তায় ফেরিওয়ালারা যে সব ভিজান ছোলা বিক্রি করে সেই ছোলা আমরা অনেকেই কিনে খাই। এই ছোলা যে চিটে ধরা গামছা দিয়ে ঢাকা থাকে সেটা একেবারেই অপরিষ্কার। নোংরা পরিবেশে ছোলায় এক রকম ছাতা পড়ে যা থেকে এক প্রকার বিষাক্ত পদার্থ বের হয় যা শরীরের ক্ষতি করে।

এই কারণে ভেজান ছোলা যেখানে সেখানে খাওয়া উচিত নয়।

চায়ের সাথে কি মাংস খাওয়া উচিত না অনুচিত ?

চায়ে যে ট্যানিন থাকে তা প্রোটিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে একটি জটিল রাসায়নিক যৌগ গঠন করে যা সহজে শরীর হজম করতে পারে না, ফলে হজমের গণ্ডগোল হয়, এবং অদূর ভবিষ্যতে তা মারাত্মক গণ্ডোগোলে পড়তে পারে।

এই কারণে চায়ের সাথে প্রোটিন খাওয়া অনুচিত।

টক ফল খেলে কি অ্যাসিড হয়?

কমলালেবু, পাতিলেবু, বাতাবীলেবুতে সাধারণত সাইট্রিক অ্যাসিড থাকে। এই অ্যাসিড পাকস্থলিতে সোডিয়াম, পটাসিয়াম প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে মিশে এমন একটা সাবান তৈরী করে যার ফলে ঐ অ্যাসিডের অম্লত্ব অনেক কমে যায়। যে কোন অ্যাসিড পেটে গেলে ঐ একই ভাবে অম্লত্ব নষ্ট হয়।

ফলে টক ফল খেলে অ্যাসিড বেড়ে যাওয়ার কথা ওঠেই না।

খোসা কি রান্নার আগে ছাড়ান উচিত না অনুচিত?

আনাজ তরকারির খোসার নীচেই থাকে পুষ্টিকর ধাতব উপাদান এবং ভিটামিন। এখন খোসা ভালো করে ছাড়ালে এই সব মূল্যবান জিনিষগুলো নষ্ট হয়ে যায়।

দেখা যাচ্ছে যে খোসা শুদ্ধ রান্না করে খোসা ছাড়িয়ে নিলে আনাজের সব কিছুই অক্ষুন্ন থাকে।

এই কারণে রান্নার আগে খোসা ছাড়ান উচিত নয়।

জিরে হলুদ আর ধনিয়া গুঁড়ো কি খাওয়া উচিত?

জিরে, হলুদ আর ধনিয়ার প্রত্যেকের গায় রং ফিরিয়ে আনার জন্য নানা রকম বিষাক্ত রং ব্যবহার করা হয়। পরে এদের যখন গুঁড়ো করা হয় তখন ঐ গুঁড়ো মশলার সাথে বিষাক্ত রং মিলে থাকে, তাছাড়া ধুলোবালি, স্টার্চজাতীয় উপাদান ইত্যাদি মেশান হয় যা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

এই কারণে জিরা, হলুদ, ধনিয়া গুঁড়ো খাওয়া উচিত নয়।

ছানার জল কি আমাদের উপকারে লাগে?

ছানার জলে প্রোটিন, ল্যাকসেজ শর্করা ও কিছু স্নেহ জাতীয় উপাদান থাকে। এছাড়া ছানার জলে কিছু ভিটামিন ও ধাতব উপাদান পাওয়া যায়। এইসব জিনিষ শরীর গঠনে কাজে লাগে।

এই কারণে ছানার জল ফেলে দেওয়া উচিত নয়। এটা আমাদের উপকারে লাগে।

বসন্তে কি আমিষ বাদ দেওয়া উচিত ?

বসন্ত রোগে রোগী প্রোটিনের অভাবে প্রচণ্ড দুর্বল হয়ে পড়ে। তাই তাদের যথেষ্ট পরিমাণ প্রোটিন দেওয়া প্রয়োজন।

এই কারণে বসন্ত রোগে মাছ, মাংস এই সব প্রোটিন যুক্ত খাদ্য খাওয়া উচিত।

ঝাঁঝাল তেল কি খুব ভাল তেল ?

বাজার থেকে কিনে আনা সরষের তেলের যে ঝাঁঝ থাকে তা সব সময় তেলের স্বাভাবিক ঝাঁঝ নয়।

তেলের ঝাঁঝ বাড়াবার জন্য এক প্রকার রাসায়নিক পদার্থ থাকে যাতে বিষাক্ত হাই-ড্রোসায়নিক অ্যাসিড থাকে এবং এটা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

এই কারণে ঝাঁঝাল তেল সবসময় ভাল নয়।

ঠাণ্ডায় কি দই কলা খাওয়া বারণ ?

খাদ্য-বিজ্ঞানীদের মতে দই কলার সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগার বা সর্দিকাশি বেড়ে যাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

ফলে ঠাণ্ডায় দই কলা খাওয়া যেতে পারে।

কুচো মাছ না বড় মাছ খাব ?

বড় মাছের আমরা অনেক কিছু বাদ দিই যেমন মাছের কাঁটা। এই মাছের কাঁটায় অনেক ক্যালসিয়াম থাকে। ফলে আমাদের শরীরে তা প্রবেশ করে না, তাছাড়া বড় মাছের ফ্যাট বেশী। কিন্তু কুচো মাছের আমরা সবটাই খেয়ে ফেলি, ফলে পুরো ক্যালসিয়াম-টাই আমরা পাই। আর কুচো মাছের ফ্যাট কম।

এই কারণে কুচো মাছ বেশী খাওয়া উচিত।

মিষ্টি খেলে কি কৃমি বাড়ে ?

বিশেষজ্ঞদের মতে কৃমির সঙ্গে মিষ্টির কোন সম্পর্ক নেই। মিষ্টি খেলে কৃমি বাড়েও না আর কমেও না। কৃমি হলে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক বিধিগুলি ভালভাবে মেনে চলা উচিত।

তাই কৃমি হলে মিষ্টি খেলে কোন ক্ষতি হয় না।

স্বাস্থ্যের সংস্কার ও সংশয়

হিরস্যুটিজম (Hirsutism) কি ?

প্রধানতঃ নারীদেহে অস্বাভাবিক লোমশ হওয়ার বৈজ্ঞানিক নাম হিরস্যুটিজ্‌ম (Hirsutism)। অল্প কিছু ক্ষেত্রে হরমোনের বিকৃতিই এই অস্বাভাবিক লোম হওয়ার কারণ। কিন্তু এটা মানবদেহের নানা পরিবর্তনের একটা মাত্র পরিবর্তন এবং একমাত্র কাজ যা করা যায় তা হল লোমগুলোকে হাইড্রোজেন পার-অক্সাইডের সাহায্যে সাদা করা বা প্রতিটি লোমের মূল নষ্ট করা।

অঙ্গ বা শারীরিক যন্ত্র প্রতিস্থাপন সম্ভব ?

গত ২৫ বছর ধরে শারীরিক যন্ত্র প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে এবং প্রায় ১০০০০০ জনের দেহে অন্যের দেহ থেকে শারীরিক যন্ত্র এনে বসানো হয়েছে। মূত্রাশয়কেই প্রধানতঃ প্রতিস্থাপিত করা হয়। কিন্তু একজন হৃদরোগীর দেহেও নিরাপদে একটা হৃৎযন্ত্র স্থানান্তরিত করা যায়। দাতা এবং গ্রহীতার রক্তের এবং কোষের মধ্যে (মিল) ঐক্য থাকলে, তবেই সঠিক ফল পাওয়া যায়।

ইনফ্লুয়েন্‌জা প্রতিরোধক টিকা কি ?

কিছু সময়ের ব্যবধানে ইনফ্লুয়েন্‌জা সংক্রামক ব্যাধি আকারে দেখা দেয়। এই কারণে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক উভয়কেই ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আগেই টিকা নিতে উপদেশ দেওয়া হয়। যদি

তারা অন্য অসুস্থতায় দুর্বল হয়ে থাকেন যেমন অ্যাস্‌মা, তাহলে একজন অভিজ্ঞ ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজটা করা যায়।

বদ-হজমের জন্য বুকে জ্বালা কমানো সম্ভব ?

যারা বদ-হজমের জন্য বুকের জ্বালায় ভোগেন তাদের আদর্শ খাদ্য হল, এমন খাদ্য যাতে আমিষ উপাদান বেশী এবং তৈল বা চর্বিজাতীয় উপাদান সামান্য থাকে। চর্বিজাতীয় উপাদান এড়াবার জন্য দৃশ্যমান চর্বিগুলোকে বাদ দেওয়া ছাড়াও মাংস, মাছ ইত্যাদি সিদ্ধ করে বা পুড়িয়ে নেওয়া উচিত। এ-ছাড়াও সামান্য পরিমাণে চর্বিযুক্ত দুগ্ধজাত দ্রব্য গ্রহণ করা উচিত। যেমন—মাখন তোলা দুধ। প্রতিদিনকার আহারে নিম্নলিখিত জিনিষগুলো তালিকাভুক্ত করতে হবে—আলু, কলা, তৈলজাতীয় পদার্থহীন ঝোল এবং প্রচুর তরল।

অবসর পদচারণের উপকারিতা আছে !

বহুলোক দৌড়োবার অভ্যাস থেকে নিজেদের বিরত রাখে বা নিজেদের দৌড়ানোর অভ্যাস কমিয়ে ফেলে। কারণ তারা নিজেদের অবস্থার উন্নতির জন্য দৌড়িয়ে ঘর্মাক্ত হওয়া বা হাঁপানোকে অপ্রীতিকর ও অযৌক্তিক বলে মনে করেন। এর প্রয়োজনীয়তাও পুরোপুরি প্রমাণিত হয়েছে। যে কেউ তার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সক্ষম হবে এই অবসর পদচারণার মত অঙ্গ সঞ্চালনে।

গ্যাসট্রিক আলসারকে বাড়ায় কারা ?

গ্যাসট্রিক আলসার বা পাকস্থলির অম্লতা পাঁজরের যন্ত্রণা সৃষ্টি করে। তামাক, কফি, অ্যালকোহল প্রভৃতি এই রোগকে বাড়তে সাহায্য করে।

হাটুর প্রতিবর্তী ক্রিয়া কি ?

নি-রিফ্লেক্স হলো পায়ের নিচের অংশের অনিচ্ছাকৃত হ্যাচকা টান। যা হলে মালাইচাকির নিচের অংশে হাতুড়ি দিয়ে হাল্কাভাবে

আঘাত করা হয়। এটা তখনই হয় যখন পা সম্পূর্ণ আলগা অবস্থায় থাকে। এই প্রতিবর্তী ক্রিয়ার অনুপস্থিতি রোগ সংক্রমণের লক্ষণ অথবা হাটু ও মধ্যনার্ভতন্ত্রের কোন স্থানের স্নায়ুকাণ্ডের মৃত্যু লক্ষণ।

মাখন যুক্ত ও মাখন তোলার পার্থক্য কোথায় ?

	চর্বিযুক্ত দুধ বা মাখনযুক্ত দুধ	মাখন তোলা দুধ
তৈল ক্যালরি	৪৮%	৩%
শর্করা ক্যালরি	৩৯ %	৫৭%
আমিষ ক্যালরি	২৯%	৪০%

মুখে রক্ত জমা হ'লে কি করা উচিত ?

প্রধানতঃ অর্শ থেকেই মুখে রক্ত জমে। কিন্তু একজন ভালো ডাক্তারের কাছে পরীক্ষা না করিয়ে এ বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না। কারণ এটা অনেক সময় টিউমারের বা অন্ত্রঘটিত রোগের লক্ষণ হতে পারে। যার জন্য তাৎক্ষণিক চিকিৎসা প্রয়োজন।

দেহের তাপমাত্রার পরিমাপ সম্ভব কিভাবে ?

গুহ্যদ্বারে অন্ততঃ 5 সে. মি. থার্মোমিটার ঢুকিয়ে যে তাপমাত্রা পাওয়া যায় সেটাই হলো দেহের সঠিক তাপমাত্রা। যখন দেহের তাপমাত্রা বগলে থার্মোমিটার রেখে নির্ণয় করা হয়, তখন থার্মোমিটারের মাপের সঙ্গে 0·5 ডিগ্রি তাপমাত্রা যোগ করতে হয়। যখন দেহের তাপমাত্রা মুখে থার্মোমিটার রেখে নির্ণয় করা হয় তখন থার্মোমিটারের তাপমাত্রার সঙ্গে 0·2 ডিগ্রি তাপমাত্রা যোগ করতে হয়।

বদহজমজনিত বুকে ব্যথা ও ধূমপানের সম্পর্ক কি ?

পাকস্থলী থেকে অম্ল অন্ননালীতে উঠে আসার ফলে এই বুক জ্বালা হয়। যে চাপ অম্লকে অন্ননালীর মধ্যে প্রবেশে বাধা দেয়, খাওয়ার পর ধূমপান করলে এই ধূমপান সেই চাপকে কমিয়ে দেয় ফলে অম্ল উপরে উঠে বুকে জ্বালা করে।

বেদনাহীন স্থানীয় অসাড়তা কি ?

আমাদের মধ্যে বেশীর ভাগ লোকই দাঁতের ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পান। কারণ আমরা জানি এটা খুব যন্ত্রণাদায়ক। বেশীর ভাগ সময় স্থানীয় অসাড় ক্রিয়া দাঁত ফুটো করার মত যন্ত্রণাদায়ক হয়। কিন্তু এখন এক নতুন পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। যার দ্বারা হয় 'মিউকুয়াস পর্দা' প্রথমে অসাড় করানো হয় অথবা উচ্চ চাপ সম্পন্ন যন্ত্রদ্বারা 'মিউকুয়াস পর্দা' ভেদ করে অসাড় করানো হয়, কিন্তু রুগী কিছুই বুঝতে পারে না।

পিঠের বিকৃতি দুর করার শিক্ষা কি ?

পিঠের বিকৃতি দূর করার শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল জলে সাঁতার কাটা এবং জলের মধ্যে ঘুরে বেড়ানো। জলের মধ্যে সম্ভাব্য সব রকমের অঙ্গ সঞ্চালনে কোন কষ্ট অনুভব হয় না।

অনেক সময় দু'টি শিশু ক্ষতিকর কেন ?

অনেক মা তার নবজাত শিশুটিকে নিয়ে এত ব্যস্ত থাকেন যে তার (শিশুটির) বড় ভাই বা বোনের কথা ভুলে যান। অথচ এই সময় তাদের স্বাচ্ছন্দ্য এবং সান্নিধ্য অত্যন্ত প্রয়োজন যার দ্বারা তারা বুঝতে পারে যে তাদের ভালোবাসা হচ্ছে এবং তাদেরও প্রয়োজন আছে।

ফ্রিক্‌লস্ কি ?

ফ্রিক্‌লস্ হল চামড়ার ওপর ছোট ছোট বাদামী রঙের ছোপ।

এটা সাধারণতঃ রোদে পোড়ার পরই দেখা যায়। কালো চামড়ার লোক অপেক্ষা ফরসা চামড়ার লোকেদের গায়ে বেশী করে ফুটে ওঠে এই ফ্রিক্‌লস্‌। এটা আবার বংশানুক্রমিক হয়। চামড়ার মধ্যেকার রঙ এক জায়গায় জড়ো হয়ে এর সৃষ্টি হয়। তাই এটা একটা একত্রিত রোদেপোড়া।

ক্লান্তিকর ঘুম ক্ষতিকর কেন?

গরম ঘরে যদি কেউ ঘুমোয় তবে মনে হয় সে বহুক্ষণ ঘুমোচ্ছে। স্বাভাবিক ঘুমের সময়টা সে স্বপ্ন দেখেই কাটায় যেটাকে নিদ্রাকালের বুকচাপা রোগের পর্যায়ে ফেলা হয়। শেষের ধরণের এই নিদ্রায় শরীর ও মনের কোন বিশ্রাম হয় না, উপরন্তু ক্লান্তি আনে।

পিঠের নিচের অংশের যন্ত্রণার ব্যায়াম কি?

অনেক লোক পিঠের নিচের দিকের ব্যাথায় ভোগেন। সাইকেল চালানো এই অসুখের একটা বেদনাহীন ভালো ব্যায়াম এবং এতে ভারী পেশীরও সঞ্চালন হয়।

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণ ক্ষতিকারক কেন?

মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের প্রথম লক্ষণ হল একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি এবং হতবুদ্ধিতা। এর সাথে সাথে হাত বা পায়ের হঠাৎ পক্ষাঘাত, কথার আড়ষ্টতা এবং চোখের দৃষ্টিহীনতাও হতে পারে। এ সব লক্ষণের কারণ, মস্তিষ্কের বদ্ধ কক্ষে রক্তধারা নির্গত হওয়ার ফলে মস্তিষ্কের বিভিন্ন কেন্দ্রে চাপের সৃষ্টি হয় এবং তাদের নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

রেটিনার ক্ষতি কিভাবে হয়?

ডাক্তারী চিকিৎসাহীন কোন রোগীর দেহে দীর্ঘকাল ধরে উচ্চ রক্তচাপ বর্তমান থাকলে তা চোখের রেটিনা বা অক্ষিপটের ক্ষতি করে। একজন ডাক্তার চক্ষুপরীক্ষায় অক্ষিপটে রক্তপাত এবং তরল পদার্থ ঘনীভূত হওয়া দেখে তা বুঝতে পারেন।

অস্ত্রোপচারের পরের জটিলতা দূর করা সম্ভব কি ?

আজকাল অস্ত্রোপচারে যে সমস্ত ব্যক্তি অংশ গ্রহণ করেন তারা প্রত্যেকে স্বাস্থ্যসম্মত নিয়ম পদ্ধতি নিষ্ঠা সহকারে পালন করেন। যেমন জীবাণুমুক্ত কাপড় বা রবার দস্তানার ব্যবহার। এর ফলে সচরাচর যে সব রোগ সংক্রমণ ও জটিলতা সৃষ্টি হয় অস্ত্রোপচারের পরে তার অনেকটাই এড়ানো সম্ভব হয়েছে।

হাড় ভাঙলে কি করতে হয় ?

যদি দুর্ঘটনায় কারো উরুর হাড় ভেঙে যায় এবং চিকিৎসার কারণে তাকে স্থানান্তরিত করার প্রয়োজন হয় তবে ঐ ভাঙা জায়গাকে বা অংশকে নিশ্চল অবস্থায় রাখার জন্য ঠেকনা দেওয়া প্রয়োজন।

রক্ত বমি হ'লে কি করা উচিত ?

রক্ত বমি এমন একটা লক্ষণ যা তৎক্ষণাৎ হাসপাতালে চিকিৎসা-যোগ্য। কারণ পাকস্থলি থেকে কতটা রক্ত বেরিয়ে গেল তা জানা সম্ভব নয় (সেটা এক মিলিলিটার না পুরো একলিটার)।

মানুষের টাক পড়ে কিভাবে ?

সাধারণ টাক পড়া একটা বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে চলে। প্রথমে কপাল, রগ ও চাঁদি থেকে চুল পড়তে থাকে। তারপর এইসব চুলপড়া জায়গা একসঙ্গে মিলে যায় (মাঝের চুল উঠে যায়)। কিন্তু বাকি চুল থেকে যায় এবং এক কান থেকে অন্য কান পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে অর্ধগোলাকৃতি ভাবে ঘাড়ের চারদিকে বাড়তে থাকে।

পাতলালোক ও ঘুমের সম্পর্ক কি ?

মোটা লোকেরা অন্যলোকের তুলনায় খুব কম চলাফেরা করে। প্রমাণিত হয়েছে যে পাতলা চেহারার লোক ঘুমের মধ্যে পাশ ফেরে এবং জায়গা বদল করে বেশি মোটা লোকের তুলনায়। সারাদিনের কাজের মধ্যে ও এই পার্থক্য অনেক। ২৪ ঘণ্টার হিসেব করলে চলাফেরার পার্থক্য দাঁড়ায় বড় মাত্রায়। মোটা লোকের চামড়ার

তলাও চর্বিযুক্ত কোষ ও অন্য অঙ্গের বৃদ্ধি হয়। এই বৃদ্ধি কিছুটা চর্বিযুক্ত কোষের জন্য এবং কিছুটা তাদের বড় আয়তনের জন্য।

পায়ে রক্ত সঞ্চালন সংক্রান্ত!

পায়ের রক্তনালী যখন আর্টিরিওসক্লিরোসিস (arteriosclerosis) দ্বারা আক্রান্ত হয় পায়ের বিভিন্ন স্থানের রক্তচাপ পরিমাপের দ্বারা বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়। যেমন পায়ে কত পরিমাণ রক্তপ্রবাহ কমে গেল এবং কোথায় রক্তনালী আর্টিরিওসক্লিরোসিস (arteriosclerosis) আক্রমনে সরু হয়ে গেল।

বিক্ষিপ্ত আলো কি?

আলোকরশ্মি চোখের দৃষ্টিপথে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিসরণের ফলে একটা কৃত্রিম আলো সৃষ্টি করে যা সমস্ত চোখে ছড়িয়ে পড়ে। এই আলোককেই বিক্ষিপ্ত আলো বলে। বিক্ষিপ্ত আলোর ফলে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে যায়। যেমন যদি কেউ গাড়ী চালায় তার সামনে কালো রং-এর পোষাক পরা কোন লোক রাস্তায় চললে সে বুঝতে পারে না।

অতিরিক্ত রক্তচাপের লক্ষণ কি?

অতিরিক্ত রক্তচাপের লক্ষণ হল মাথাধরা, মাথাঘোরা, চোখের সামনে সব কিছু যেন দুলতে থাকে এবং সবকিছুতেই অনিচ্ছা। সুতরাং উপরোক্ত এক বা একাধিক লক্ষণ থাকলে তার প্রতিকারের জন্য সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার দেখানো উচিত। তা নাহলে একটা দীর্ঘস্থায়ী রোগে পরিণত হতে পারে।

যুক্তিসম্মত খাওয়ার অভ্যাস কেন দরকার?

১। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্যালরি খাওয়া বন্ধ করা দরকার।

২। তিন ভাগের একভাগ খাদ্য চর্বিযুক্ত থাকবে।

৩। অসম্পৃক্ত এবং কম সম্পৃক্ত চর্বিযুক্তখাদ্য বেশী খাওয়া উচিত।

৪। চিনি যতটা কম সম্ভব খাওয়া উচিত।

৫। বেশী সবজি, ফল, আলু, মাখনতোলা দুধ, চর্বিছাড়া মাংস, মাছ, শস্য দ্বারা উৎপন্ন খাদ্য খাওয়া প্রয়োজন।

প্রাতঃরাশ সংক্রান্ত বিধিনিষেধ !

যদি কেউ তার দেহের ওজন কমাতে চান বা নির্দিষ্ট রাখতে চান তবে তার প্রত্যহ প্রাতঃরাশ করা আবশ্যক। কোন ব্যক্তি প্রাতঃরাশ না করলে দীর্ঘসময় অভুক্ত থাকার ফলে প্রচণ্ড খিদে পায়, ফলে পরবর্তী কালে আহারের সময় ব্যক্তিটি প্রচুর আহার করে এবং তা প্রাতঃরাশ করার পরের আহারের থেকে বেশী। এটা ক্ষতিকারক।

হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস যন্ত্র বিষয়ক !

অস্ত্রোপচারের সময় সংবহনের কাজ উপশম করার জন্য কৃত্রিম হৃদ্ ফুসফুস যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। হৃদ্‌যন্ত্রকে একটা পাম্পের দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা হয় যা (পাম্প) অক্সিজেন-বিহীন রক্তকে কৃত্রিম ফুসফুসে চালনা করে এবং অক্সিজেন যুক্ত রক্ত দেহের সর্বত্র সরবরাহ করে।

জোনথেরাপি কি ?

আকুপাংচারের মত জোনথেরাপির কোন বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। এই পদ্ধতি অনুসারে পায়ে এমন কোন স্থান নেই যা শরীরের বর্জ্য পদার্থ সরিয়ে দিতে পারে অথবা অসুস্থতা সারাতে পারে।

ভিটামিন 'ই' বিষয়ক !

কিছুকাল আগে এক অনুসন্ধানের বিবরণ পাওয়া গেছে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় একটা ইঁদুরকে ভিটামিন 'ই' সমৃদ্ধ খাবার দেওয়া হলো যাকে আগে ভিটামিন 'ই' বর্জিত খাবার দেওয়া হত। দেখা গেল ইঁদুরটার শরীর সুন্দর লোমে ঢেকে গেল। এই পরিণামের জন্য তখন থেকেই এটা অনুমান করা হয় যে ভিটামিন 'ই' এর

অসংখ্য ভালোগুণ আছে এবং এর জন্যে টাক মাথায় ও চুল গজায়।

পাতলা (রোগা) হবার বড়ি বিষয়ক !

রোগা হবার জন্য কি বড়ি আছে ? উত্তর হল না। যতক্ষণ না অসুস্থ হবে এমনকি অসুস্থ হলেও ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোন বড়ি খাওয়া উচিত না। আহার-সম্বন্ধীয় ভুল ওষুধ সাধারণ মনুষের ক্ষতিই করে। কারণ বড়ি বা ওষুধ নতুন কোন খাদ্যাভ্যাস তৈরী করে না। খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন না করলে আবার তার ওজন বাড়তে থাকবে। তাই নতুন খাদ্যসূচী অভ্যাস শুরু করে অনিষ্টকর রোগের আক্রমণ থেকে বাঁচতে হবে।

সূর্যস্নান বিষয়ক !

স্থূর্যস্নান কখনোই খুব বেশী করা উচিত নয়। যদি কারো দেহের চামড়া স্থূর্যের আলোতে থাকতে অভ্যস্থ হয়, তবে তার দেহের চামড়াকে কোন প্রকার প্রতিরক্ষা ছাড়া মধ্যাহ্নে সূর্যের আলোয় বেশী সময় ধরে রাখা উচিত নয়। কারণ এর ফলে দেহের চামড়ায় রৌদ্রের একজিমা হয় এবং চামড়ার উপর ছোট ছোট লাল পিণ্ডের মত হয়; যা প্রায় এক বছর থাকে। তবে সকালের রোদ্দুর শরীরের পক্ষে উপকারী।

জিভের ওপর কাটা বিষয়ক !

জিভ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটা অঙ্গ (দেহযন্ত্র) যার সাহায্যে আমরা কথা বলি, কোন জিনিষ চুষে খাই, গিলে খাই, কোন জিনিষের স্বাদ অর্থাৎ টক, মিষ্টি, তেতো, ঝাল ইত্যাদি বুঝি। তবু ও ভিজ কেটে গেলে সাধারণত বিপদের সম্ভবনা থাকে না। জিভ সেলাই করার দরকার পড়েনা। নিজে নিজেই জোড়া লেগে যায়।

শরীরে চর্বির প্রবনতা বিষয়ক !

কেবলমাত্র অনিয়মিত খাদ্যাভ্যাসেই একজন লোক মোটা হবে কিনা—নির্ধারণ করে না। আমাদের জীবনের শুরু থেকেই চর্বির কোষের সংখ্যা সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আসা যায়। কোন কোন লোকের ক্ষেত্রে এই স্থূলতা বংশ-পরম্পরায় এসে থাকে। কিন্তু এই সমস্যার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত এখনো অসম্পূর্ণ। এখনো অনেক প্রয়োজনীয়তা স্থূলতা-প্রশ্নের মীমাংসা এবং এর উৎপত্তি সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় প্রশ্নের সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বসে কাজের ভঙ্গিমার পরিবর্তন বিষয়ক !

বসে কাজ করার সঠিক ভঙ্গিটা অত্যন্ত জরুরী। কিন্তু প্রত্যেকেরই অনেক সময় ধরে কাজ করার সময় বসার ভঙ্গিমার পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যাতে দেহের ওজনের চাপ কোন নির্দিষ্ট পেশী বা স্নায়ুর ওপর না পড়ে।

ফোলা রসগ্রন্থি বিষয়ক !

শ্বাস-নালীর উপরের অংশে যখন রোগ সংক্রামিত হয় এমন গলার সংক্রমন হয়, ঘাড়ের রসগ্রন্থি ফোলে। এর কারণ রসগ্রন্থিগুলি রোগ জীবাণুর বিস্তারে বাধার সৃষ্টি করে।

স্নায়ুর উপর চাপ বিষয়ক !

টেনডোনিটেস (Tendonites) হাতের অত্যধিক ক্রিয়ার (পরিশ্রমের) ফলে হতে পারে। যদি ফোলা অংশ স্নায়ুর উপর চাপ দেয় তাহলে যন্ত্রণা হবে এবং অনুভূতির বিঘ্ন ঘটবে। এই সমস্যা সাধারণতঃ সমাধান করা হয় হাতকে সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিয়ে উত্তোলিত অবস্থায় কিছুদিন রেখে দিয়ে।

স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্বন্ধে সংশয়

সর্দিজ্বরে কি করতে হয় ?

নাক দিয়ে চোখ দিয়ে জল পড়া, শরীর ও মাথাব্যথা, বারবার হাঁচি, গলার ও বুকের ব্যথা ইত্যাদি সর্দিজ্বরের প্রধান লক্ষণ। এর চিকিৎসার নানা পথ আছে।

বারবার হাঁচি, শুকনো কাশি, জ্বরে পিপাসা, ঘাম না হওয়া, প্রস্রাব লাল, অস্থির অস্থির ভাব লাগলে চোখ মুছে ৩।৪ মাত্রা একোনাইট প্রয়োগ করা উচিত। সর্দিজ্বরে ঘন ঘন শ্বাস, বুক সাঁই সাঁই করে, শুকনো কাশি এবং বুকে ব্যথা থাকলে ইপিকাক ব্যবহার করা ভাল। যে সর্দিজ্বরে চোখ-মুখ লাল, প্রচণ্ড মাথাব্যথা, অনিদ্রা, একশো ডিগ্রীর উপরে জ্বর এবং রুগী প্রলাপ বকতে থাকলে বেলেডোনা ব্যবহার করা উচিত। যে জ্বরে বেশী হাঁচি হয়, নাক জ্বলে, বেশী পিপাসা থাকে এবং খাওয়া মাত্র বমি হয়, সেই জ্বরে আর্সেনিক এলাম ৩০ ব্যবহার করা ভাল। কোষ্ঠবদ্ধতা বা পেটে গ্যাস হ'লে, সর্দিজ্বরে বারবার প্রস্রাব বা মলত্যাগের বেগ থাকলে নাক্সভমিকা ৩০ দেওয়া ভাল। শুকনো সর্দি জ্বরে, নিমোনিয়ায়, কোষ্ঠবদ্ধতা ও শক্ত পায়খানা হলে, ঠোঁট জিভ শুকনো হ'লে, মুখের স্বাদ তেঁতো হ'লে, চুপচাপ শুয়ে থাকার ইচ্ছে হ'লে, দীর্ঘসময় অন্তর জল খেলে ৪ মাত্রা ব্রাইয়োনিয়া ৩০ দেওয়া ভাল। এইসব জ্বরে প্রথমে একোনাইট বা ফেরমফস দিলে অংকুরেই জ্বর কমে যায়। না কমলে যে লক্ষণে যে ওষুধের কথা বলা হয়েছে তাই ব্যবহার করা ভাল।

নতুন সর্দিতে কি করতে হয় ?

নতুন সর্দিতে পাগুলি ধুয়ে তলায় বেশ করে তেল লাগিয়ে উনুনের তাপে পা গরম করলে খুব তাড়াতাড়ি সর্দি সেরে যায়।

সর্দির সময় কি রকম পথ্য ?

সর্দির সময় লঘু পথ্য ভাল। জ্বর না থাকলে মাংসের ঝোল দেওয়া ভাল।

কফজ্বরে কি করতে হয় ?

কফ জ্বরে কন্টকারী, গুলঞ্চ ও বাসকের ক্বাথ মধু দিয়ে পান করলে কফজ্বর কমে যায়। কফজ্বরে কফ যদি শুকনো হয়ে যায় তবে পিপুল, মরিচ, শুঁঠ ও রাখাল-শসার মূল চূর্ণ করে মধুর সঙ্গে চেটে খেলে কফ তরল হয়ে নির্গত হয় ও কফজ্বরের উপশম হয়। পোস্তার ঢেঁড়ি, বাসক, যোয়ান ও পিপুলের ক্বাথ পান করলে শ্বাসকষ্ট ও কাশিসমেত কফজ্বর কমে যায়।

বাত-শ্লেষ্মাজ্বরে কি করতে হয় ?

চই, রক্ত চিতার মূল, পিপুল মূল এবং শুঁঠের ক্বাথ সেবন করলে বাত-শ্লেষ্মা কমে যায়। বাত-শ্লেষ্মা শুকনো হয়ে নির্গত না হলে পিপুল, মরিচ, শুঁঠ ও রাখালশসার মূল চূর্ণ করে মধুর সঙ্গে চেটে খেলে কফ তরল হয়ে নির্গত হয়ে যায় এবং বাত-শ্লেষ্মাজ্বরের উপশম হয়। বাত-শ্লেষ্মাজ্বরে শ্বাসকষ্ট, কাশি, অরুচি, বুক ও পার্শ্ববেদনা থাকলে কুড়, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও কণ্টকারীর ক্বাথ পান করলে কমে যায়। এই জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা ও পেটের ব্যথা থাকলে হরিতকী, কটকী, মুথা, পিপুল মূল ও সোঁদাল ফলের ক্বাথ সেবন করলে মল নির্গত হয়ে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ কমে যায়।

সর্দিকাশিতে অসুস্থ ব্যক্তিদের পক্ষে আদা কিভাবে কাজে লাগে ?

কণ্ঠকারী ফুলের কেশর চূর্ণ করে ১ আনা মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেলে উপকার হবে। এককালে বেশি না দিয়ে অল্প অল্প করে দিনে ৫।৬ বার দিতে হবে। শিশুদের কালরোগে এটা খুবই ফলপ্রদ। কণ্ঠকারীর পাতা ও ডাঁটা, গোলমরিচ এবং তেজপাতা প্রত্যেকটি ৪

আনা পরিমাণ নিয়ে তাতে ১ ছটাক তালমিছরী দিয়ে আধসের জলে ফুটিয়ে আধপোয়া থাকতে নামিয়ে ফেলতে হবে। তারপর সকালে ও সন্ধ্যায় পান করলে সর্দি কাশিতে খুব উপকার পাওয়া যাবে। মিছরীর সঙ্গে আদার রস খেলে সর্দি কাশিতে উপকার হয়।

শ্লেষ্মায় আকন্দের ফল কিভাবে কাজে লাগে?

আকন্দের ফল থেকে যে তুলা পাওয়া যায়, ওই তুলার সাহায্যে শ্লেষ্মাযুক্ত স্থান বেঁধে দিলে শ্লেষ্মা তরল হয় ও শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়।

হাঁপানীর শ্বাসকষ্ট কিভাবে কমে?

হাঁপানীর জন্য শ্বাসকষ্ট হ'লে আকন্দমূলের ছাল উত্তমরূপে চূর্ণ করে তার সঙ্গে আকন্দ আঠা ভালভাবে মিশিয়ে রোদে শুকোতে হবে। এবার যখন হাঁপানীর টান বৃদ্ধি পাবে, তখন ওই গুঁড়ো দিয়ে চুরুট নির্মান করে ধূমপান করলে শ্বাসকষ্টের অনেক উপশম হয়।

পিত্ত শ্লেষ্মাজ্বরে কি করতে হয়?

ধনে ও পলতার ক্বাথ সেবন করলে আমদোষ ও শ্লেষ্মা বিনষ্ট হয় এবং অগ্নিবৃদ্ধি করে। পিত্ত সরল হয়ে তাড়াতাড়ি জ্বরের উপশম হয়। নিম ছাল, ত্রিফলা, পলতা ও যষ্ঠীমধুর ক্বাথ পান করলে দাহ পিপাসা সমেত পিত্ত-শ্লেষ্মাজ্বর কমে। পিত্ত-শ্লেষ্মাজ্বরে তরল পায়খানা বেরোতে থাকলে মুথা, ধনে, বালা, বেলছাল, বেনামূল, মোচরস ও শুঁটের ক্বাথ পান করলে ঐ সব উপসর্গসহ পিত্ত শ্লেষ্মাজ্বর কমে।

সন্নিপাতিক জ্বরে কি করতে হয়?

এই জ্বর ভয়ানক। এতে বায়ু, পিত্ত ও কফ এই তিনটে দোষেরই প্রভাব বাড়ে। প্রথম থেকেই খুব সাবধান হতে হয়। কাকড়া শৃঙ্গী, কণ্টকারী, কুড়, জরালভা, শুঁঠ, শঠি, গুলঞ্চ, আকনাদি ও কণ্টকীর ক্বাথ পান করলে শ্বাস, কাশি, তন্দ্রা, হৃদয় ও পার্শ্ববেদনার সঙ্গে সান্নিপাতিক জ্বর কমে যায়। ক্ষেত পাপতা, রক্তচন্দন, মুথা,

বেনমূল, কিসমিস, বালা ও আমলকীর ক্বাথ পান করলে পিপাসার সঙ্গে সান্নিপাতিক জ্বর কমে যায়।

সান্নিপাতিক জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে কি করতে হয়?

সান্নিপাতিক জ্বরে কোষ্ঠবদ্ধতা থাকলে শুঁঠ, গুলঞ্চ, দশমূল ও চিরতার ক্বাথের সঙ্গে চার আনা তিউড়ীচূর্ণ মিলিয়ে সেবন করলে পায়খানা পরিষ্কার হয়ে জ্বর কমে যায়।

সান্নিপাতিক জ্বরে বিকারপ্রাপ্ত হয়ে রোগী অজ্ঞান হলে কি করতে হয়?

সান্নিপাতিক জ্বরে রোগী অজ্ঞান হয়ে গেলে মরিচ, পিপুল, শিরিস বীজ, সৈন্ধব, মনছাল, বচ ও রসুন সমপরিমাণে নিয়ে গো-মূত্রসহ বেটে চক্ষুতে অঞ্জন দিলে বিকার নষ্ট হয়ে রোগী চেতনা পায়।

কর্ণমূলের শোথ ও সান্নিপাতিক জ্বর কিভাবে কমে?

চিরতা, দশমূল, ত্রিফলা শুঁঠ ও মরিচের ক্বাথ পান করলে কানের শোথ ও সান্নিপাতিক জ্বর নষ্ট হয়।

ম্যালেরিয়া জ্বরে কি করতে হয়?

ম্যালেরিয়া জ্বরে কুইনিন খেতে হয়। প্রতিদিন এক তোলা পরিমিত তুলসী রস সেবন করলে ম্যালেরিয়া জ্বর কমে যায়।

কি খেলে পুরাতন জ্বর কমে?

বাবুই তুলসীর মূল আড়াইটি গোলমরিচসহ বেটে তিনদিন খেলে পুরাতন জ্বর কমে যায়।

একদিন অন্তর জ্বর হ'লে কি করতে হয়?

রক্তচন্দন, বেনামূল, ধনে, গুলঞ্চ, মুথা ও শুঁঠের ক্বাথ মধুর সঙ্গে সেবন করলে দাহ ও তৃষ্ণাদিসহ একদিন অন্তর জ্বর কমে যায়।

রাত্রিজ্বরে কি করতে হয়?

কাকমাচির মূল কানে বেঁধে রাখলে রাত্রিজ্বর নষ্ট হয়।

জীর্ণজ্বরে কি করতে হ'য়?

গুলঞ্চের ক্বাথ শীতল হ'লে এক তোলা মধু মিশিয়ে পান করলে জীর্ণজ্বর নষ্ট হয়।

প্লীহা ও উদরী খারাপ হওয়ার সঙ্গে জীর্ণজ্বর হ'লে কি করতে হয়?

আধ তোলা মধুর সঙ্গে দুই আনা পিপুলচূর্ণ মিশিয়ে প্রত্যহ-প্রাতে খেলে প্লীহা ও উদরীর খারাপ হওয়ার সঙ্গে জীর্ণজ্বর কমে যায়।

মন্দাগ্নি, অরুচি, অজীর্ণ, কাশিশ্বাস, হৃদরোগ, পাণ্ডু ও কৃমি রোগসহ জীর্ণজ্বর হ'লে কি করতে হয়?

চার আনা গুড়ের সঙ্গে দুই আনা পিপুলচূর্ণ মিশিয়ে শীতল জলসহ প্রত্যেকদিন খেলে এইসব উপসর্গ ও জীর্ণজ্বর কমে যায়।

বর্ষাকালে সর্দিরোগ হ'লে কি করতে হয়?

বর্ষাকালে সর্দিরোগ হ'লে গরম জল ঠাণ্ডা করে তাতে একটু সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে স্নান করলে সর্দি ভাল হয়।

সর্দি ও কাশিতে কি কি করণীয় আছে?

একটা কাঠিতে আদার কুচি গেঁথে ঘি মিশিয়ে প্রদীপের শিখায় সেঁকে চিবিয়ে খেলে সর্দিরোগ ভাল হয়। ঘোষাগোটা গাছের একটি ফল জলে ভিজিয়ে সেই জল দুই ফোঁটা নাকে ঢেলে দিলে এক দিনেই সর্দি ভাল হয়। কাঁচা রসুন এক কোয়া আস্ত বা বেটে ভাত খাবার সময় খেলে সর্দি ভাল হয়। হলুদ, বচ, কুড়, পিপুল, জীরে, ক্ষেত্রাখানা, যষ্ঠীমধু ও সৈন্ধব লবণ প্রত্যেকটি সিকি তোলা নিয়ে গুঁড়ো করে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে চেটে খেলে কফের পরিপাক ও নিঃসরণ দুটোই হবে।

শিশুদের সর্দিকাশিতে কি করতে হয়?

শিশুদের সর্দি-কাশি—হ'লে তুলসীপাতা ও তুলসীমঞ্জুরীর রস নয় / দশ ফোঁটা টাটকা মধুসহ খেলে সর্দি কাশি সেরে যায়। নয় / দশ ফোঁটা টাটকা মধু ও সামান্য আদার রস খাওয়ালে শিশুদের সর্দি কাশি সেরে যায়। বাসক ছাল, বাসক পাতা ও বাসক শিকড় অল্প জলে সিদ্ধ করে সন্ধ্যায় অল্প পরিমাণে খাওয়ালে কাশি ভাল হয়। বচের গুঁড়া, তালমিছরীর গুঁড়া মুখে রাখলে

কাশির উপকার হয়। নতুন সর্দিতে সরষের তেল অল্প গরম করে গলা, হাতের তেলো ও পায়ের তেলোতে মালিশ করলে সর্দি সেরে যায়।

শিশুদের পেট ফাঁপলে কি করতে হয়?

নারকেল তেলে সাবান ঘষে পেটে প্রলেপ দিলে শিশুদের পেটফাঁপা কমে যায়। চূণের স্বচ্ছ জল ৪/৫ ফোঁটা অথবা মৌরী ভেজানো জলের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুদের পেটফাঁপা ও অজীর্ণ রোগ ভাল হয়।

শিশুদের দুধতোলা কিভাবে নিবারিত হয়?

প্রতিদিন তিন/চারবার টাটকা তেল পেটে মালিশ করলে অথবা এক টুকরো ফ্লানেল উলীবস্ত্র পেটে জড়িয়ে রাখলে শিশুদের দুধতোলা নিবারিত হয়।

হঠাৎ রসতড়কা হ'লে কি করতে হয়?

হঠাৎ রসতড়কা হ'লে সরষের তেল ও জল একত্রে মিশিয়ে মাথায়, হাতে ও পায়ে লাগালে এবং চোখে ও মুখে জলের ঝাপটা দিলে শিশুদের এই রোগ সেরে যায়।

শিশুদের পেটের অসুখ হ'লে কি করতে হয়?

জামপাতার, জামছাল ও আমড়াছালের রস ২ আনা ও তিন / চার ফোঁটা মধু মিশিয়ে খাওয়ালে শিশুদেব অতিসার রোগ সেরে যায়। যষ্ঠীমধু, খৈ, চিনি, আতপচাল—ধোয়া জল ও মধু খাওয়ালে শিশুদের পেটের পীড়া, আমাশয় প্রভৃতি সেরে যায়। ডালিমপাতার রস চিনি দিয়ে সেবন করালে শিশুদের আমরক্ত ও অতিসার সেরে যায়।

অতিরিক্ত ভোজনহেতু পেটের অসুখে জ্বর হ'য়ে জিহ্বায় সাদা প্রলেপ পড়লে কি করতে হয়?

এক্ষেত্রে রোগীকে আলসেটিলা পরিমাণ মতো দিতে হয়।

গা-হাত পা বেদনা নিয়ে জ্বর, জলে ভিজে জ্বর এবং জিহ্বার ত্রিকোণ লালবর্ণ হ'লে কি করতে হয়?

এক্ষেত্রে রাসটক্স ৩০ পরিমাণ মতো খাওয়াতে হয়।

তীব্র জ্বর, মাথার দিকটা বেশি গরম, নিম্নভাগ ঠাণ্ডা, অত্যধিক মাথা বেদনা এবং চোখ লাল থাকলে কি করতে হয়?

এক্ষেত্রে বেলেডোনা ৩০ পরিমাণ মতো দিতে হয়।

যে কোন জ্বরের প্রথমাবস্থায় কি খাওয়া ভাল?

ফেরমফস খাওয়া প্রয়োজন।

কোষ্ঠবদ্ধতা, পেটে গ্যাস—এ রকম সর্দিজ্বরে কি করতে হয়?

এক্ষেত্রে নাক্সভমিকা ৩০ দিতে হয়।

শুকনো সর্দিজ্বরে, ডানদিকে নিমোনিয়া, কোষ্ঠবদ্ধতা ও শক্ত পায়খানা হ'লে এবং ঠোঁট-জিভ শুকনো হ'লে কি করতে হয়?

এক্ষেত্রে ব্রাইয়োনিয়া ৩০ দিতে হয়।

পালাজ্বরে যদি পেট বায়ুতে পূর্ণ থাকে এবং রক্তাপ্লতা শীত, উত্তাপ ও ঘাম ইত্যাদি উপসর্গ থাকলে কি করতে হয়?

এক্ষেত্রে চায়না ৩০ দিতে হয়।

টাইফয়েড জ্বরে কি করতে হয়?

অনেক কারণে এ জ্বর হয়। দীর্ঘদিন ধরে জ্বর থাকলে টাইফয়েড হবার সম্ভাবনা থাকে। প্রথম প্রথম ব্রাইয়োনিয়া ৩০ প্রয়োগ করলে সেরে যায়। রোগী তীব্র প্রলাপ বকলে, তীব্র মাথা ও চোখ মুখ লাল হ'লে বেলেডোনা ৩০ দিতে হবে। রোগী দুর্বল নিস্তেজ হলে, মৃতের ন্যায় শুয়ে থাকলে, পাখার বাতাস চাইলে কার্বোভেজ ৩০ দিতে হয়।

ডেঙ্গুজ্বরে কি করতে হয়?

এই জ্বরে সন্ধিস্থানে প্রবল ব্যথা হয়, জ্বর ১০৫°-র উপর উঠে যায়, মাথার ব্যথা থাকে, কোষ্ঠবদ্ধতা থাকে, মুখ লাল থাকে। জ্বর কমে আবার জ্বর হয়। এক্ষেত্রে বেলেডোনা ৩০ খেলে উপকার পাওয়া যাবে। জ্বরের প্রথমাবস্থায় একোনাইট দেওয়া যেতে পারে।

ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জায় হোমিওপ্যাথির কি ওষুধ ভাল?

একোনাইট ৩০ দিলে ভাল। পুরনো কাশি, চোখ-মুখ লাল,

ঢোক গিললে ব্যথা ইত্যাদি লক্ষণে বেলেডোনা খেলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

ডিপথেরিয়ায় কি করতে হয়?

এই অসুখে জ্বর হবে, শীত করে ও চেহারা লাল হয়। লালা ঝরলে, গলা বন্ধ থাকলে একোনাইট ৩০ দেওয়া ভাল।

পাকাশয়ের রোগ হ'লে কি করতে হয়?

অম্বল, কোষ্ঠকাঠিন্য, আমাশয়, প্লীহা, লিভার বড় হওয়া, জিহ্বায় সাদা বা হলদে বর্ণের লেপ, অরুচি, বমি বমি ভাব, পাকস্থলীতে জ্বলন, ঠাণ্ডা জল খেলে বিকার, সুচফোটানো বেদনা, দুর্বলতা ইত্যাদি লক্ষণ থাকলে একোনাইট ৩০ ভাল। আহারে অজীর্ণ, বমি ভাব, পিপাসা-হীন, জিহ্বায় সাদা বর্ণের লেপ ইত্যাদি থাকলে পালসেটিলা ৩০ খাওয়া ভাল। প্রায়ই অম্বল হলে এবং বার বার পায়খানার বেগ থাকলে নাক্সভমিকা খাওয়া ভাল। সমস্ত পেট ফাঁপলে, অজীর্ণতে চায়না খাওয়া ভাল। সর্বদা বমি বমি ভাব হ'লে, সবুজ পায়খানায় ইপিকাক ৩০ খাওয়া ভাল।

বমি বমি ভাব থাকলে কি খাওয়া ভাল?

বমি বমি ভাব থাকলে ইপিকাক ৩০ খাওয়া ভাল।

বদহজমে ঢেকুর উঠলে, পেটে বায়ুর উর্দ্ধচাপ থাকলে কি খেতে হয়?

কার্বোভেজ ৩০।

বদহজম ও গা বমি বমি করলে এবং পেট ভার হ'লে কি খেতে হয়?

নাক্সভমিকা ৩০।

অগ্নিমান্দ্যে কি খাওয়া ভাল?

এতে কার্বোভেজ ৩০ বা সালফার ৩০ ভাল ফল দেবে।

রক্তামাশয়ে কি করতে হয়?

রক্তামাশয়ে মার্কশল ৩০, ইপিকাক ৩০, কার্বোভেজ ৩০, পালসেটিলা ৩০ ইত্যাদি রোগীর উপসর্গ বুঝে প্রয়োগ করতে হয়।

গ্যাস্ট্রিক আলসারে কি খেতে হয় ?

গ্যাস্ট্রিক আলসারে রোগীর অবস্থা বুঝে ইউরেনিয়াম নাইট্রিকস (৩ এক্স), আর্জেণ্টস (৩০), কোলবাইক্রোম (৩ এক্স) ইত্যাদি খেতে দিতে হয়।

কি কি করলে পাতলা পায়খানা নিরাময় হয় ?

আখের গুড়সহ বেল পুড়িয়ে খেলে পাতলা পায়খানা নিরাময় হয়। আধখানা পান সামান্য পরিমাণ যোয়ান সহ শিলে বেটে খেলে পাতলা পায়খানা বন্ধ হয়। এনটারোকুইনল খেলে ও পাতলা পায়খানা শক্ত হয়।

সাদা আমাশয় হ'লে কি করতে হয় ?

থানকুনি পাতার রস ও মুথারস একত্রে খাওয়ালে আমাশয়ের উপসম হয়।

রক্ত-আমাশয়ে কি করতে হয় ?

দু'তোলা আদা ও দু'তোলা বাবুই তুলসীর পাতা একত্রে বেটে ২০/২৫টা বড়ি প্রস্তুত করে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় একটি করে খেলে এ রোগ সেরে যায়।

ক্রিমি হ'লে কি করতে হয় ?

কালমেঘের পাতার রস প্রাতে খাওয়ালে ক্রিমি নষ্ট হয়। আনারসের পাতার রস মধুর সঙ্গে খাওয়ালে ক্রিমি নষ্ট হয়। উচ্ছে-পাতার রসের সঙ্গে সামান্য গরম জল মিশিয়ে পান করলে ক্রিমি নষ্ট হয়।

পিত্তাশয়ে পাথুরী হ'লে কি করতে হয় ?

রোগীর অবস্থা বুঝে ব্যরবরিস কিউ, ক্যালকেরিয়া কার্ব ৬, ৩০ ; হাইড্রোটিস কিউ, বেলেডোনা ৬, ৩০ ; চায়না ৩০ ইত্যাদি খাওয়ানো উচিত। সবচাইতে ভাল হয় অপারেশন করে পাথর বের করে দেওয়া।

মূত্রে পাথুরী হ'লে কি করতে হয় ?

রোগীর অবস্থা বুঝে লাইকোপোডিয়াম ৬, ২০০ ; ক্যান্থারিস ৩০, টেরিবিন্থিনা ৩০ ইত্যাদি প্রয়োগ করতে হয়। অপারেশন করে পাথরকে বের করা সবচাইতে ভাল।

ব্রোঙ্কাইটিসে কি করতে হয় ?

রোগীর অবস্থা বুঝে একোনাইট ৩, আর্সেনিক ৩০, ফসফরাস ৩০, চায়না ৩০, মর্কসাল ৩০ ইত্যাদি প্রয়োগ করা ভাল।

প্লেগে কি করতে হয় ?

অবস্থা বুঝে ইগ্নেশিয়া ৩০, বেলেডোনা ৩০, ফসফরাস ৩০, জেলেসিমিয়াস ৩০ ইত্যাদি দিতে হয়।

কলেরায় কি করা উচিত ?

অবস্থা বুঝে ক্যাম্ফার ৩০, কার্বোভেজ ৩০, নুন ও চিনি মিশ্রিত জল অল্প অল্প করে বহুবার দিতে হয়। তবে এক্ষেত্রে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই সবচাইতে ভাল।

প্লীহা ও যকৃৎ রোগে কি করতে হয় ?

হরিতকী রোহিতকের ক্বাথ প্রত্যহ প্রাতে খেলে প্লীহা ও যকৃৎ ভাল হয়। বিড়ঙ্গ, গবক্ষার, পিপুল লাটাকরঞ্জের মূলের ক্বাথ সেবন করলে প্লীহা ও যকৃৎ ভাল হয়।

হিক্কা ও শ্বাস কিভাবে বিনষ্ট হয় ?

বড় এলাচের দানা চূর্ণ করে কিছুটা চিনির সঙ্গে মিশিয়ে খেলে শিশুদের হিক্কা কমে যায়। ছাগলের দুধে শুঁঠ সিদ্ধ করে খেলে হিক্কা কমে যায়।

বমি কি করে কমে ?

মুড়ি ভেজানো জল খেলে বমি কমে যায়। শসার আঁতির জল খেলে বমি কমে।

জিভে ঘা হলে কি করতে হয় ?

ভেড়ীর দুধ জিভে লাগালে শিশুদের জিভের ঘা কমে যায়। সোহাগার খৈ মধুর সঙ্গে জিভে লাগালে জিভের ঘা কমে যায়।

চোখের অসুখের জন্য কি করতে হয় ?

শেওড়া গাছের আঠায় কাজল করে চোখে দিলে শিশুদের চোখ ভাল হয়। প্রত্যেকদিন ৫/৬ বার চোখে গোলাপ জল অথবা পরিষ্কার জলের ছিঁটে দিলে চোখ ভাল থাকে।

শিশুদের দাঁত উঠতে দেরী হ'লে কি করতে হয় ?

জায়ফল ও পিপুলচূর্ণ মধুর সঙ্গে মিশিয়ে শিশুদের দন্তমাড়িতে ঘষলে শীঘ্রই দাঁত উঠতে পারে।

গায়ে ঘামাচি হলে কি করতে হয় ?

গুলঞ্চের রস গায়ে মাখলে ঘামাচি ভাল হয়। গায়ে শ্বেতচন্দন ঘষলে ঘামাচি মরে যায়।

হঠাৎ আগুনে পুড়ে গেলে কি করতে হয় ?

হঠাৎ আগুণে পুড়লে সঙ্গে সঙ্গে দগ্ধস্থানে কেরোসিন তেল লাগালে আরাম লাগে ও ফোস্কা হয় না। নারকেল তেলে চুন মিশিয়ে লাগালে ভাল হয়। পুঁই পাতার রস লাগালে ভাল হয়। দইয়ের মাৎ লাগালে ভাল হয়। গোল আলু বেটে দগ্ধস্থানে লাগালে জ্বালা কমে।

হাত-পা কেটে গেলে কি করতে হয় ?

দুর্বাঘাস চিবিয়ে কাটাস্থানে লাগালে রক্তপাত বন্ধ হয়। গাঁদা ফুলের পাতা বেটে কাটার জায়গায় লাগিয়ে বেঁধে দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়। পাথরকুচির পাতা বেটে কাটা জায়গায় প্রলেপ দিলে জোড়া লাগে এবং রক্তপাত বন্ধ হয়।

রাতকানা হলে কি করতে হয় ?

পেঁয়াজের রস চোখে দিলে চোখ ভাল হয়। রক্ত বকফুলের গাছের পাতা হাতে রগরিয়ে দুই চোখে দুই ফোঁটা রস পনেরো দিন দিলে চোখ ভাল হয়।

নাক দিয়ে রক্তপাত হ'লে কি করা প্রয়োজন?

দুর্বারস অথবা ডালিমের পাতার রস নস্য করে লাগালে নাক দিয়ে রক্তপাত বন্ধ হয়। নাক দিয়ে প্রতিদিন জল টেনে মুখ দিয়ে বের করে দিতে পারলে নাক ও শ্বাসপ্রশ্বাস ভাল হয়।

ছুলি হ'লে কি করতে হয়?

শুকনো কলাপাতা-পোড়ানো ছাই জলে গুলে ভালভাবে ছেঁকে একটু হলুদের গুঁড়ো ওই জলে মিশিয়ে ছুলিতে লাগালে ভাল হয়।

চোখ উঠলে কি করতে হয়?

তামার পাত্রে মধুর সঙ্গে লবঙ্গ ঘষে চোখে ফোঁটা দিলে বিশেষ উপকার হয়।

কানে তালা লাগলে ও পাকলে কি করা ভাল?

রসুনের রস অল্প গরম করে কানে দিলে ভাল হয়।

আলজিভ বড় হ'লে কি করতে হয়?

নুনমেশানো গরম জলে গলা গরম করে কুলকুচি করতে হয়। গমের ভূষি আধতোলা, গোলমরিচ আধতোলা, যষ্ঠীমধু আধতোলা, মিছরি আধতোলা, আধসের জলে মিলিয়ে গরম করে একপোয়া থাকতে নামিয়ে এক চামচ করে বহুবার খেলে তিন দিনে আরোগ্য হয়।

বাচ্চারা প্রায়ই বিছানায় প্রস্রাব করলে কি করা উচিত?

কৃমির ওষুধ খাওয়ানো ভাল এবং প্রতিদিন শোবার আগে প্রস্রাব করিয়ে নিতে হবে। মাঝে মাঝে রাতে তুলে প্রস্রাব করিয়ে আনতে পারলে ভাল হয়।

হাঁপানি ও কাশি কি করলে কমে?

ধুতুরার পাতা কুচি কুচি করে কেটে কলিকায় তামাকের মতো খেলে হাঁপানি ভাল হয়।

মাথার ব্যথায় কি করতে হয়?

কিছুটা কর্পূর ঘিয়ের সঙ্গে মিশিয়ে নাকে টানলে ও কপালে লেপন করলে মাথাব্যথা কমে যায়। আকন্দের আঠায় খুটিযার

ছাই মিশিয়ে শুকিয়ে গুঁড়া করে সকালে ও সন্ধ্যায় নাকে টানলে কঠিন শিরঃপীড়া সেরে যায়। মাথা ধরলে মাথা ধুয়ে অন্ধকার ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকলে মাথাব্যথা কমে। একান্ত না কমলে অ্যানালজিন, নোভালজিন, স্যারিডন, অ্যানাসিন ইত্যাদি ট্যাবলেট খেলে পাঁচ মিনিটে মাথাব্যথা কমে যায়।

দাঁতে পোকা হ'লে কি করতে হয়?

হিং গরম করে দাঁতে লাগালে দাঁতের পোকা নষ্ট হয়। দাঁত মাঝে মাঝে খয়ের-এর সংস্পর্শে বা তামাক পাতার সংস্পর্শে রাখলেও দাঁতের পোকা নষ্ট হয়।

কড়া কি করে সারে?

গেঁটেকড়ি ভস্ম, লেবুর রসে মাড়িয়ে খাওয়ালে কড়া সেরে যায়।

নখকুনি হ'লে কি করতে হয়?

নখকুনিতে নখের মধ্যে একটু আফিং দিয়ে বেঁধে রাখলে নখকুনি সেরে যায়।

খোস, পাঁচড়া হ'লে কি করতে হয়?

সরষের তেলের সঙ্গে একটু গাঁজা মিশিয়ে রোদে গরম করে লাগালে খোস ভাল হয়। মাখন ও গন্ধক সমানভাবে মেড়ে মলম তৈরী করে পাঁচড়ায় ৩/৪ দিন লাগালে পাঁচড়া তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

অর্শরোগ কিসে সারে?

কৃষ্ণতিলের শাঁস, হরিতকী, ভেলার আঁঠি, পুরনো ইক্ষুগুড় একসঙ্গে মিশিয়ে জলসহ উপযুক্ত মাত্রায় খেলে অর্শরোগ সেরে যায়।

চুল ওঠা রোগে কি করতে হয়?

গুণচট পোড়া ছাই এবং আফুলা বেলের শিকড় জলে বেটে চুলের গোড়ায় ৩/৪ দিন লাগালে চুল ওঠা বন্ধ হয়।

কি করলে ঘা সারে?

কাঞ্চন ফুলের পাতা ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হয়।

মাথায় টাকপড়া কি করে বন্ধ করা যায় ?

হরিতাল, বহেড়া, বৃহত্তর মূল সমান পরিমাণ নিয়ে মধুর সঙ্গে মিশিয়ে টাকে প্রলেপ দিলে টাক ভাল হয়।

পাকুঁই ঘা হ'লে কি করতে হয় ?

পায়ের আঙুলের মধ্যে মেদির পাতাসিদ্ধ জল দিয়ে কয়েকবার ধুলে পাঁকুই ভাল হয়। বেটে প্রলেপ দিলে সবচাইতে ভাল হয়।

স্বরভঙ্গ হ'লে কি করতে হবে ?

বহেড়াল, সৈন্ধব লবন ও পিপুলচূর্ণ, দুই আনা মাত্রায় ঘোলের সঙ্গে পান করলে স্বর পরিষ্কার হয়।

বার বার পিপাসা কিসে দূর হয় ?

গুড়ের সঙ্গে দধির সরবৎ করে খেলে পিপাসা নষ্ট হয়।

অরুচি কিসে নষ্ট হয় ?

পালিতাপাতার বড়া ভেজে ভাতের সঙ্গে খেলে অরুচি নষ্ট হয়।

উন্মাদরোগ প্রথম অবস্থায় কি করে সারানো যায় ?

ব্রাহ্মীশাকের রস দুইতোলা, পুরানো কুষ্মাণ্ডের জল চারতোলা মাত্রায় সামান্য একটু মধুর সঙ্গে পান করলে উন্মাদ রোগের প্রথম অবস্থায় খুব ভাল ফল লক্ষ্য করা যায়। আমলকী রস, বাগুড়া, ঘৃতকুমারীর রস, হিমসাগর রস একত্রে মাথায় মাখলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

মূর্চ্ছা গেলে কি করতে হয় ?

চোখে-মুখে জলের ঝাপটা দিতে হয়। হিং ও কর্পূর সামান্য পরিমাণ ন্যাকড়ার পুঁটলি করে শুকালে জ্ঞান ফিরে পায়। নিশাদল পুড়িয়ে সেই ধোঁয়া নাকে দিলে মূর্চ্ছা ভাঙে। স্মেলিং সল্ট নাকে শোঁকালে অল্প সময়েই জ্ঞান ফিরে পায়।

মৃগীরোগে কি করতে হয় ?

ছোট এলাচ, মুগমুথা, যব, বেনার মূল, হরিতকী, আমলকী ও বহেড়া, ছাগমূত্রে পেষন করে চোখে দিলে রুগী জ্ঞান ফিরে পায়।

হৃদরোগে কি করতে হয় ?

অশ্বগন্ধাচূর্ণ চার আনা, এক কাপ গরম দুধের সঙ্গে মিছরি মিশিয়ে খেলে হৃদরোগের খুব উপকার হয়।

অম্লশূলে কি করা ভাল ?

তিল পেষন করে অল্প গরম করে পেটে প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়।

বাতরোগে কি করা উচিত ?

আতপ চাল, আদা, হিং একসঙ্গে বেটে গরম করে ব্যথার জায়গায় প্রলেপ দিলে ব্যথা কমে যায়।

আমবাত হ'লে কি করা ভাল ?

গুলঞ্চ, দেবদারু ও শুঁঠের ক্কাথ, রক্তমূল পান করলে সর্বাঙ্গবাত, আমবাত, সন্ধি, মজ্জা ও অস্থিগত বাতের সত্বর নিরাময় হয়।

শুঁয়োপোকা গায়ে লাগলে কি করতে হয় ?

প্রথমে ডুমুরের পাতা ঘসে শুঁয়োগুলি তুলে সেখানে চুন লাগতে হবে অথবা আধপাকা চালতা বেটে মোটা করে প্রলেপ দিলে জ্বালা তাড়াতাড়ি কমে যায়।

মাকড়সার গরল লাগলে কি করা ভাল ?

রান্নাঘরের ঝুল ও শোধিত গন্ধক চার আনা মাত্রায় নিয়ে বেটে নারকেল তেল সহ লাগালে মাকড়সার গরল নষ্ট হয়।

ইঁদুরে কামড়ালে কি করা উচিত ?

সৈন্ধবলবন, হলুদ, মঞ্জিঠা, ঝুল, বিষে কামড়ানোর জায়গায় প্রলেপ দিলে ইঁদুরের বিষ নষ্ট হয়।

ভীমরুল, বোলতা ও মৌমাছি কামড়ালে করণীয় কি ?

চুনে গরুর গোবর মিশিয়ে প্রলেপ দিলে যন্ত্রনা কমে। পুঁইপাতার রস কামড়ানোর জায়গায় দিলে জ্বালা কমে।

ব্রণ ও ফোড়া হ'লে কি করতে হয় ?

তিসির খইল জলের সঙ্গে বেটে গরম করে ফোড়ার জায়গায় প্রলেপ দিলে ব্রন ও ফোড়া নষ্ট হয়।

বিছা কামড়ালে কি করতে হয় ?

রাঙাশাকের পাতা মুখে চিবিয়ে ঘা-মুখে দিলেই জ্বালা কমে যায়। নিমপাতা ঘিয়ে বেটে গরম করে লাগালেও ঘা ভাল হয়।

দাদরোগে কি করতে হয় ?

ধূনা, সোহাগা, গন্ধক, ফিটকারি সমান পরিমাণ নিয়ে কেরোসিন তেলে মিশিয়ে লাগালে দাদ ভাল হয়।

উকুন কমাতে কি করা উচিত ?

শোবার সময় পানের রস চুলে দিলে উকুন মরে যায়। ভাটির পাতার রস শোবার সময় চুলে দিয়ে পরের দিন চুল ধুয়ে ফেললে উকুন মরে যায়।

চোখের ছানি হ'লে কি করা ভাল ?

তেলাকুচার রসে মধু দিয়ে চোখে অঞ্জন দিলে চোখের ছানি কাটে।

হাম ও বসন্তে কি করতে হয় ?

কলমীশাকের ঝোল, আদা তুলসী ইত্যাদি হাম উঠবার সময় খাওয়ালে দেহ-মধ্যস্থ হাম ভালভাবে বের হয়ে যায়। হাম বেরোবার পর তিনদিন নিম-হলুদ মাখাতে হয়, তিন দিনে যদি হাম গায়ে মিলিয়ে না যায়, তবে পাঁচদিন নিম-হলুদ মাখাতে হয়। কন্টিকারীর মূল গোলমরিচের সঙ্গে বেটে খেলে বসন্ত হয় না। উচ্ছেপাতার রস এক তোলা ও হরিদ্রাচূর্ণ দশরতি একসঙ্গে খেলে বসন্ত রোগের উপকার হয়।

পাদদারী বা পা ফাটায় কি করতে হয় ?

নারকেল তেলের সঙ্গে ঘুঁটের ছাই গরম করে লাগালে পা-ফাটা সেরে যায়।

রসবাতে গা কামড়ালে কি করতে হয় ?

ছোলা কাটখোলায় ভেজে নিমের আঠায় ভিজিয়ে রোদে না

দিয়ে শুকিয়ে এক সিকি বা অর্ধ তোলা মাত্রায় শোবার সময় খেলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হবে ও গা কামড়ানি সেরে যাবে।

ধনুষ্টঙ্কারে কি করতে হয় ?

গাঁজার ধোঁয়া নাকে টানলে, গাঁজা জলে গুলে খাওয়ালে ধনুষ্টঙ্কার রোগ ভাল হয়।

দাঁতের গোড়া দিয়ে রক্ত পড়লে কি করতে হয় ?

বেগুনপাতা চিবিয়ে বা বেটে সেই জায়গায় দিলে রক্ত বন্ধ হবে।

শরীরের কৃশতা কি করে নষ্ট করা যায় ?

গোক্ষুরেচূর্ণ এক তোলা, এক পোয়া ছাগী দুগ্ধের সঙ্গে সিদ্ধ করে আধপোয়া থাকতে নামিয়ে সামান্য মধুর সঙ্গে মিশিয়ে প্রত্যেকদিন খেলে শরীরের কৃশতা নষ্ট হয়।

শরীরের স্থূলতা কি করে নষ্ট করা যায় ?

শুষ্ক মূলাচূর্ণ বা ত্রিফলাচূর্ণ আধতোলা মধুর সঙ্গে বেটে খেলে শরীরের স্থূলতা নষ্ট হয়।

পেটে বায়ু জমে গরম হ'লে কি করতে হয় ?

ইসবগুল এক তোলা জলে ভিজিয়ে মিছরি দানার সঙ্গে খেলে পেট গরম প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কমে যায়।

ঘাড়ে শয়নজনিত ব্যথা হ'লে কি করতে হয় ?

থানকুনি পাতা লবণের সঙ্গে বেটে ছয়/সাত বার প্রলেপ দিলে ব্যথা ভাল হয়ে যায়।

আঁচিল নষ্ট করতে কি করা উচিত ?

শুষ্ক হরিদ্রা পুড়িয়ে চুণের সঙ্গে উত্তমরূপে মিশিয়ে লাগালে ৩/৪ দিনেই আঁচিল নষ্ট হয়।

পক্ষাঘাতে কি করতে হয় ?

আলকুশীবীজ, রাস্না, বেড়েল, অশ্বগন্ধা, মাষকলাই, পঞ্চতৃণ

এরণ্ডমূলের ক্বাথের সঙ্গে, কিছুটা হিংচূর্ণ ও সৈন্ধব লবণ মিশিয়ে ঈষৎ গরম থাকতে পান করলে পক্ষাঘাত ভাল হয়ে যায়।

'কাউর ঘা'তে কি করা উচিত ?

কালোজিরা, মাখন ও ঝুল এক আনা করে নিয়ে একটা কাঁসার বাটিতে নিমের ডাল দিয়ে আধ ছটাক চীনে সিন্দুর মিশিয়ে ঘায়ে লাগালে কাউর ঘা ভাল হয়ে যায়।

দন্তশূল কিসে কমে ?

তুঁতে ও চূর্ণ সমান পরিমাণ মিলিয়ে (আধতোলা করে) খদির চূর্ণ (এক তোলা) আধসের জলে জ্বাল দিয়ে মুখে কুলকুচা করলে দন্তশূল নষ্ট হয়।

যক্ষাতে কি করা উচিত ?

অশ্বগন্ধা, শতমূলী দশমূল, বেড়েলা, গুলঞ্চ, আতইস, রাস্না, পুষ্করমূল এবং বাসকের ক্বাথ পান করলে যক্ষারোগ অনেকটা সেরে যায়।

পাথুরী হ'লে কি করতে হয় ?

নারকেল পুষ্প গুবাকের সঙ্গে চিবিয়ে খেলে পাথুরী সেরে যায়।

শিশুর চোয়াল টরে গেলে, কান্না, খিচুনি ও মুখ দিয়ে ফেনা উঠলে কি করা উচিত ?

শিশুর বিভিন্ন অবস্থা অনুসারে একোনাই অথবা আর্নিকা অথবা নাক্সভম অথবা জেলসিমিয়াম ইত্যাদি খাওয়াতে হয়।

শিশুর অনিদ্রা রোগে কি খাওয়াতে হয় ?

কফিয়া খাওয়ানো ভাল। ক্রিমিজনিত অনিদ্রায় সিনা ও নাক্সভম ইত্যাদি ব্যবহার করতে হয়।

শিশুর দাঁতকপাটি লাগলে কি করতে হয় ?

আঘাতজনিত এই অসুখে আর্নিকা, অজীর্ণতাজনিত দাঁতকপাটিতে নাক্সভম, রক্তস্রাব হেতু অসুখে হ্যামাসেলিস উপকারী। আঘাত-জনিত এই রোগে হাইপেরিকাম ভাল ঔষধের কাজ করে।

শিশুদের ঘুংড়ী কাশি হলে কি করতে হয় ?

এটা দুই রকমের হয়। কৃত্রিম ও প্রকৃত। হঠাৎ গলা সুড়সুড়নিসহ নিদ্রাভঙ্গ, গলা ঘড়ঘড়ানি, শ্বাসপ্রশ্বাসে সাঁইসাঁই শব্দ ইত্যাদি কৃত্রিম ঘুংড়ীর লক্ষণ। কষ্টকর কাশি, স্বরভঙ্গ, গলাব্যথা, প্রবল জ্বর ইত্যাদিতে প্রথমে একোনাইট এবং উপশম হ'লে স্পঞ্জিয়া, জ্বর কমে গেলে আপেক্ষিক কাশিতে স্যাম্বুকাল ও সরল কাশিতে ইপিকাক খুব ভাল কাজ দেয়।

শিশুর কান্নার কারণ কি করে বোঝা যায় ?

কানে হাত দিয়ে কাঁদলে কানের অসুখ, মুখে আঙুল দিয়ে কাঁদলে দাঁত ওঠা এবং হাঁটু গুটিয়ে পেটের উপর রাখলে পেটের ব্যথা বুঝতে হবে। কারণ বুঝে সেই মতো ওষুধ দিতে হবে।

পেট কামড়ানিতে শিশুদের কি ওষুধ দেওয়া ভাল ?

আহারের দোষ, ক্রিমি, ঠাণ্ডালাগা প্রভৃতি কারণে শিশুর পেট কামড়ায়। ক্রিমিজনিত পীড়ায় সিনা প্রধান ঔষধ। খাবার দোষে উদরাময়জনিত এই পীড়ায় পালসেটিলা ভাল। কোষ্ঠকাঠিন্য-হেতু পেট কামড়ালে নাক্সভমিকা ভাল। সবুজ রঙের পাতলা পায়খানা, হাত পা ঠাণ্ডা ও খিটখিটে মেজাজ ইত্যাদি উপসর্গে ক্যাথোসিলা খেলে ফল পাওয়া যায়। এ সময় বাচ্চার মার গুরুপাক খাবার খাওয়া নিষেধ।

শিশুর দাঁত-ওঠার সময় কি করতে হয় ?

ক্যাথোসিলা এক্ষেত্রে ভাল ফল দেয়।

পাকা চুল কালো হবার উপায় কি ?

সীমের আঁঠা, তিল শাঁস, তিলতেলে মিশিয়ে মাথায় দিলে কিছুক্ষেত্রে পাকাচুল কালো হয়।

মুখের দুর্গন্ধে কি করতে হয় ?

যোয়ান, ধনিয়া, যষ্ঠীমধু ও ঘোরী এক তোলা করে নিয়ে চার

তোলা মিছরির সঙ্গে মিশিয়ে রাতে শোবার আগে গরমজলের সঙ্গে খেলে মুখের দুর্গন্ধ ও কাশি ভাল হয়।

বায়ুরোগে কি করতে হয়?

মস্তকি চূর্ণ, পোস্ত ও গুজরাটি এলাচদানা এক ছটাক করে নিয়ে, মিছরি পাঁচ ছটাক এবং গুলঞ্চের ছাল চূর্ণ আধপোয়া একসঙ্গে মিশিয়ে আধ তোলা মাত্রায় ভাগ করে রেখে একখানা আটার রুটি আধপোয়া জলে রাত্রে ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে ওই জলে আধ তোলা গুঁড়ো মিশিয়ে খেলে বায়ুরোগ ভাল হয়।

সাপের বিষ কিভাবে নষ্ট করা যায়?

প্রথমে কামড়ানো জায়গায় বাঁধন দিতে হবে। কুড়তগর পাতুকা মধু ও ঘি এক ছটাক করে একসঙ্গে নিয়ে মিশিয়ে রোগীকে খাওয়ালে ভয়ঙ্কর সাপের বিষও নষ্ট হয়। শ্বেত-করবীর শিকড় খেলে সাপের বিষ নষ্ট হয়। তবে কামড়াবার সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়াই ভাল।

কুকুরের বিষ কিভাবে নষ্ট করা যায়?

ধুতুরাপাতার রস, ঘৃত, গুড়, মধু সমভাগে আট তোলা খেলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়। বচ, হিং বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, আকনাদি, আতইচ, ত্রিকুট গজপিপ্পলীর ক্বাথ পান করলে সব রকমের বিষ নষ্ট হয়।

কেউ বিষ খেলে কি করতে হয়?

বিষপানকারী যাতে বমি করে বিষটা সঙ্গে সঙ্গে তুলে ফেলতে পারে তার দিকে সবার আগে নজর দেওয়া উচিত। গরম নুনজল খেয়ে গলায় আঙুল দিয়ে বমি করতে হয়। তারপরে দেখতে হয় রোগী যাতে ঘুমিয়ে না পড়ে। তুঁতে জল খাইয়েও বমি করানো যায়। বমি করাবার পর নিমপাতা ও কাঁচা হলুদ একসঙ্গে বেটে গায়ে মাখালে এবং ঘি কাঁচা হলুদের রস চিনি অথবা মধুর সঙ্গে খাওয়ালে সবরকমের বিষ নষ্ট হয়।

পেটের ব্যথা হলে কি করতে হয় ?

শেওড়ার শিকড়ের ছাল, সাতটা গোলমরিচের সঙ্গে চিবিয়ে খেয়ে দুই ঘটি জল মাথায় দিতে হবে। এতে ব্যথা না কমলে একটু তেল জলে ফেটিয়ে নাভির চারপাশ মালিশ করলেই পেট ব্যথা কমবে। তাতেও না কমলে বরালগান ট্যাবলেট খেলে পেটে ব্যথা কমবেই।

জ্বর নামাবার জন্য এলোপ্যাথি ওষুধ কি ব্যবহার করা যায় ?

জ্বর নামাবার জন্য ক্রোসিন বা ক্যালপল ট্যাবলেট খাওয়ানো যেতে পারে। বেশি জ্বর হ'লে কপালে জলপটি দিয়ে মাথা ভাল করে মুছে দিতে হয়।

খুব শ্বাসকষ্টে এলোপ্যাথি ওষুধ কি খেতে হয় ?

অ্যাসথেলিন খেতে হয়। ডেরিফেলিন ইন্‌জেকশন হাতের রগে দিলে খুব ভাল। ডেরিফেলিন ট্যাবলেটও খাওয়া যেতে পারে।

মুখে বেশী লালা পড়লে কি করতে হয় ?

রাতে শোবার আগে পান খেয়ে পরে কুলকুচা করে খড়িকা খেয়ে ঘুমালে মুখের লালা পড়া বন্ধ হয়।

দাঁত নড়লে কি করা উচিত ?

হিজলফল চূর্ণ করে ওই গুঁড়া দিয়ে দাঁত মাজলে দাঁত-নড়া সারে।

ব্যঙ্গরোগে বা মেছতাতে কি করতে হয় ?

দুধের সঙ্গে মুসুর ডাল বেটে একটু ঘি মিশিয়ে মুখে লাগালে সাত দিনের মধ্যে সেরে গিয়ে মুখের শ্রীবৃদ্ধি হয়। ননী, পুরানো গুড়, মধু, কুলে আঁটির শাঁস একসঙ্গে বেটে মুখে লাগালে ব্যঙ্গ রোগ বা মেছেতা সেরে যায়।

নালিঘার ওষুধ কি ?

তেলাকুচারসে তুঁতিয়ার গুঁড়া মিশিয়ে নালি ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হয়ে যায়।

কর্ণমূল ফুললে কি করতে হয় ?

আদার রসে মুসব্বর গুলে গরম করে প্রলেপ দিলে কর্ণমূল ফোলা সেরে যায়। জলে গুলগুল গুলে গরম করে কানের ফুটোয় ফোঁটা করে দিলে কানের কটকটানি সেরে যায়।

কান পরিষ্কার রাখার উপায় কি ?

কানের ফুটোয় তেল গরম করে ঠাণ্ডা অবস্থায় ঐ তেল কয়েক ফোঁটা দিতে হবে। এরকম দুদিন দিলেই কানের নোংরা নরম হবে। তারপর কোন খোচানি দিয়ে নোংরা তুলে ফেলতে হবে।

উৎকাশি হলে কি করতে হয় ?

বংশলোচন ছয় মাষা, জাঙ্গী হরিতকী, কাবোবচিনি, দারুচিনি, পোস্ত ঢেঁড়ি ইত্যাদির চূর্ণ তিন মাষা করে, যষ্ঠীমধু তিন মাষা জলে ভিজিয়ে সেই জল দিয়ে ওই চূর্ণগুলো মেড়ে ছোলার মতো বড়ি করে শুকিয়ে সেই বড়ি সকালে, বিকালে ও রাত্রে তালমিছরি সমেত চুষে খেলে উৎকাশি তাড়াতাড়ি সেরে যায়।

হঠাৎ বেদনা হ'লে কি করতে হয় ?

সরিষার তেলে কর্পূর মিশিয়ে রোদে গরম করে মালিশ করলে বা সেঁক দিলে ব্যথা কমে যায়।

মাথা ঠাণ্ডা থাকে কি করে ?

ঘৃতকুমারী শাঁস মাথায় মালিস করলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে। পাগলের পক্ষেও এটা ভাল ওষুধ। শতবৌত ঘি মাথায় মালিস করলেও পাগলের মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

হঠাৎ চোট লাগলে হোমিওপ্যাথি ওষুধ কি খেতে হয় ?

হঠাৎ চোট লাগলে (পা মচকে গেলে, হাড়ে ব্যথা লাগলে) আর্নিকা কয়েক ফোঁটা দুই-তিন ভাগে অল্প সময় অন্তর খেতে হবে। পা মচকে গেলে মচকানো জায়গায় চারপাশে চুন হলুদ গরম করে লাগালে ব্যথা ও ফুলো অনেকটা কমে যায়। আর্নিকা মচকানো জায়গায় লাগানোর ব্যবস্থাও রয়েছে।

পায়ের হাজার জন্য কি করতে হয় ?

সরষের তেল এক কাঁচা ও কন্টকারীর রস এক ছটাক একসঙ্গে মিশিয়ে দিন পনেরো রোদে রাখতে হবে, পরে ওই তেল হাজার জায়গায় ভাল করে লাগালে হাজা ভাল হয়ে যায়।

রক্তদুষ্টিতে কি করতে হয় ?

রক্ত-দুষ্টি হলে প্রত্যেকদিন সকালে এক ছটাক করলা পাতার রস খেলে রক্ত-দুষ্টি সেরে যায়।

পুরানো ঘায়ে ও কৃমিরোগে করলা (উচ্ছে) কিভাবে কাজে লাগানো যায় ?

আট আনা পরিমাণ করলা পাতার রস এক সপ্তাহ খেলে ক্রিমি ভাল হয়। শিশুদের এক কাঁচা পরিমাণ খেতে দিতে হবে। করলা পাতা বেটে পুরাণো ঘায়ের উপর প্রলেপ দিলে তাড়াতাড়ি উপকার পাওয়া যায়।

রক্ত অর্শে কাঁটানটে কিভাবে ব্যবহার করা যায় ?

কাঁটানটের পাতা বেটে অর্শের উপর প্রলেপ দিলে রক্তপাত বন্ধ হয়।

হিক্কা রোগে কি করতে হয় ?

কালকাসুন্দার পাতা জলে সিদ্ধ করে সেই জল পান করলে হিক্কা রোগে উপকার পাওয়া যায়।

গোদ রোগে কি করতে হয় ?

গব্যঘৃতের সঙ্গে কালকাসুন্দার মূল ভেজে প্রলেপ দিলে ভাল হয়। যদি রোগীর গায়ে জ্বর থাকে, তাহলে গব্যঘৃতের সঙ্গে কালকাসুন্দার মূল ভেজে সকালে এক চামচ করে সেবন করাতে হবে। দরকার হ'লে মাত্রা বাড়িয়ে দিতে হবে।

———